বড়দিদি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ়, ১৩২৯

মূল্য এক টাকা

অষ্টম সংস্করণ

প্রিণ্টার—অবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
"সিদ্ধেশ্বর প্রেস্"
৭৭ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

বড়দিদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে, আবার থপ্ করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে। তাহাদিগের পিছনে সদা-সর্ব্বদা একজন লোক থাকা প্রয়োজন,—সে যেন আবশ্যক অনুসারে, খড় যোগাইয়া দেয়।

গৃহস্থ-কন্যারা মাটির দীপ সাজাইবার সময় যেমন তৈল এবং শলিতা দেয়, তেমনি তাহার গায়ে একটি কাটি দিয়া দেয়। প্রদীপের শিখা যখন কমিয়া আসিতে থাকে,—এই ক্ষুদ্র কাটিটির তখন বড় প্রয়োজন,—উস্কাইয়া দিতে হয়; এটি না হইলে তৈল এবং শলিতা-সত্ত্বেও প্রদীপের জ্বলা চলে না।

সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিও কতকটা এইরূপ। বল, বুদ্ধি, ভরসা, তাহার সব আছে, তবু সে একা কোন কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারে না। খানিকটা কাজ সে যেমন উৎসাহের সহিত করিতে পারে, বাকিটুকু সে তেমনি নীরব আলস্যভরে ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। তখনই একজন লোকের প্রয়োজন—সে উস্কাইয়া দিবে।

সুরেন্দ্রের পিতা সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতি করিতেন। বাঙলা দেশের সহিত তাঁহার বেশী কিছু সম্বন্ধ ছিল না। এইখানেই সুরেন্দ্র তাহার কুড়ি বৎসর বয়সে এম্, এ পাশ করে। কতকটা তাহার নিজের গুণে, কতকটা বিমাতার গুণে। এই বিমাতাটি এমন অধ্যবসায়ের সহিত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিতেন যে, সে অনেক সময় বুঝিতে পারিত না যে, তাহার নিজের স্বাধীন সত্তা কিছু আছে কি না! সুরেন্দ্র বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জীব এ জগতে বাস করে, না, এই বিমাতার ইচ্ছাই একটি মানুষের আকার ধরিয়া কাজকর্ম্ম, শোয়া-বসা, পড়াশুনা, পাশ প্রভৃতি সারিয়া লয়! এই বিমাতাটি, নিজের সন্তানের প্রতি কতকটা উদাসীন হইলেও, সুরেন্দ্রর হেফাজতের সীমা ছিল না। থুথুফেলাটি পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না! এই কর্ত্তব্য-পরায়ণা স্ত্রীলোকটির শাসনে থাকিয়া, সুরেন্দ্র নামে লেখা-পড়া শিখিল, কিন্তু আত্মনির্ভর শিখিল না। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না। কোন কর্ম্মই যে তাহার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ হইতে পারে, ইহা সে বুঝিত না। কখন্ যে তাহার কি প্রয়োজন হইবে, এবং কখন্ তাহাকে কি করিতে হইবে, সেজন্য সে সম্পূর্ণরূপে আর একজনের উপর নির্ভর করিত। ঘুম পাইতেছে, কি ক্ষুধা বোধ হইতেছে, অনেক সময়, এটাও সে নিশ্চিত ঠাহর করিতে পারিত না। জ্ঞান হওয়া অবধি, তাহাকে বিমাতার উপর ভর করিয়া, এই পঞ্চদশ বর্ষ কাটাইতে হইয়াছে। সুতরাং বিমাতাকে তাহার জন্য অনেক কাজ করিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টা তিরস্কার, অনুযোগ, লাঞ্ছনা, তাড়না, মুখবিকৃতি, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার বৎসর, পূর্ব্ব হইতেই, তাহাকে

সমস্ত রাত্রি সজাগ রাখিবার জন্য নিজের নিদ্রাসুখ-বিসর্জ্জন দিতে হইত! আহা, সপত্নীপুত্রের জন্য কে কবে এত করিয়া থাকে! পাড়া-প্রতিবাসীরা এক মুখে রায়-গৃহিণীর সুখ্যাতি করিয়া উঠিতে পারে না।

সুরেন্দ্রর উপর তাঁহার আন্তরিক যত্নের এতটুকু ত্রুটি ছিল না—তিরস্কার-লাঞ্ছনার পর-মুহূর্ত্তে যদি তাহার চোখ-মুখ ছল-ছল করিত, রায়-গৃহিণী সেটি জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ নিশ্চিত বুঝিয়া, তিন দিনের জন্য তাহার সাগু ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মানসিক উন্নতি এবং শিক্ষা-কল্পে, তাঁহার আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সুরেন্দ্রর অঙ্গ পরিষ্কার কিংবা আধুনিক রুচি-অনুমোদিত বস্ত্রাদি দেখিলেই তাহার সখ এবং বাবুয়ানা করিবার ইচ্ছা তাঁহার চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িয়া যাইত, এবং সেই মুহূর্ত্তেই দুই তিন সপ্তাহের জন্য, সুরেন্দ্রর বস্ত্রাদি রজক-ভবনে যাওয়া নিষিদ্ধ হইত।

এমনি ভাবে সুরেন্দ্রর দিন কাটিতেছিল। এমনি সস্নেহ সতর্কতার মাঝে কখন কখন তাহার মনে হইত, এ জীবনটা বাঁচিবার মত নহে,—কখন বা সে মনে ভাবিত, বুঝি এমনি করিয়াই সকলের জীবনের প্রভাতটা অতিবাহিত হয়। কিন্তু এক এক দিন আশ-পাশের লোকগুলা গায়ে পড়িয়া তাহার মাথায় বিভিন্ন ধারণা গুঁজিয়া দিয়া যাইত।

একদিন তাহাই হইল। একজন বন্ধু তাহাকে পরামর্শ দিল যে, তাহার মত বুদ্ধিমান্ ছেলে বিলাত যাইতে পারিলে, ভবিষ্যতে অনেক উন্নতির আশা আছে। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া সে অনেকের অনেক উপকার করিতে পারে। কথাটা সুরেনের মন্দ লাগিল না।

বনের পাখীর চেয়ে পিঞ্জরের পাখীটাই বেশী ছট্‌ফট্ করে! সুরেন্দ্র কল্পনার চক্ষে যেন একটু মুক্ত বায়ু, একটু স্বাধীনতার আলোক, দেখিতে পাইতেছিল, তাই তাহার পরাধীন প্রাণটা, উন্মত্তের মত, পিঞ্জরের চতুর্দ্দিকে ঝট্‌পট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সে পিতাকে আসিয়া নিবেদন করিল যে, তাহার বিলাত যাইবার উপায় করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে যে সকল উন্নতির আশা ছিল—তাহাও সে কহিল। পিতা কহিলেন, 'ভাবিয়া দেখিব।' কিন্তু গৃহিনীর ইচ্ছা একেবারে প্রতিকূল। তিনি পিতা-পুত্রের মাঝখানে ঝড়ের মত আসিয়া পড়িয়া এমনি অট্টহাসি হাসিলেন যে, দুই জনেই স্তম্ভিত হইয়া গেল!

গৃহিনী কহিলেন, "তবে আমাকেও বিলাত পাঠাইয়া দাও—না হইলে সুরোকে সাম্‌লাইবে কে? যে জানে না, কখন্ কি খাইতে হয়, কখন্ কি পরিতে হয়, তাকে একলা বিলাত পাঠাইতেছ? বাড়ীর ঘোড়াটাকে সেখানে পাঠান যা, ওকে পাঠানও তাই। ঘোড়া-গরুতে বুঝিতে পারে যে, তার খিদে পেয়েছে, কি ঘুম পেয়েছে—তোমার সুরো তাও পারে না—" তার পর আবার হাসি!

হাস্যের আধিক্য দর্শনে রায় মহাশয় বিষম লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। সুরেন্দ্রনাথও মনে করিল যে, এরূপ অকাট্য যুক্তির বিপক্ষে আর কোনরূপ প্রতিবাদ করা যায় না। বিলাত যাইবার আশা সে ত্যাগ করিল। তাহার বন্ধু এ কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল। কিন্তু বিলাত যাইবার আর কোন উপায় আছে কি না, তাহাও সে বলিয়া দিতে পারিল না কিন্তু অবশেষে কহিল যে, এরূপ পরাধীন-

ভাবে থাকার চেয়ে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া শ্রেয়ঃ ; এবং ইহাও নিশ্চয় যে, এরূপ সম্মানের সহিত যে এম্, এ পাশ করিতে পারে—উদরান্নের জন্য তাহাকে লালায়িত হইতে হয় না।

সুরেন্দ্র বাটী আসিয়া এ কথা ভাবিতে বসিল। যত ভাবিল, তত সে দেখিতে পাইল যে, বন্ধু ঠিক বলিয়াছে—ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভাল। সবাই কিছু বিলাত যাইতে পারে না, কিন্তু এমন জীবিত ও মৃতের মাঝামাঝি হইয়াও সকলকে দিন কাটাইতে হয় না।

একদিন গভীর রাত্রে সে ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতার টিকিট্ কিনিয়া গাড়ীতে বসিল, এবং ডাকযোগে পিতাকে পত্র লিখিয়া দিল যে, কিছুদিনের জন্য সে বাড়ী পরিত্যাগ করিতেছে ; অনর্থক অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ লাভ হইবে না, এবং সন্ধান পাইলেও যে, সে বাটীতে ফিরিয়া আসিবে, এরূপ সম্ভাবনাও নাই।

রায়-মহাশয় গৃহিণীকে এ পত্র দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, "সুরো এখন মানুষ হইয়াছে, বিদ্যা শিখিয়াছে—পাখা বাহির হইয়াছে—এখন উড়িয়া পলাইবে না ত কখন্ পলাইবে !"

তথাপি তিনি অনুসন্ধান করিলেন—কলিকাতায় যাহারা পরিচিত ছিল, তাহাদিগকে পত্র দিলেন ; কিন্তু কোন উপায় হইল না। সুরেন্দ্রর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার জনকোলাহলপূর্ণ রাজপথে পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণিল! এখানে তিরস্কার করিবারও কেহ নাই, দিবানিশি শাসনে রাখিতেও কেহ চাহে না! মুখ শুকাইলে কেহ ফিরিয়া দেখে না, মুখ ভারি হইলেও কেহ লক্ষ্য করে না! এখানে নিজেকে নিজে দেখিতে হয়। এখানে ভিক্ষাও জোটে, করুণারও স্থান আছে, আশ্রয়ও মিলে, কিন্তু আপনার চেষ্টা চাই! স্বেচ্ছায় কেহই তোমার মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না।

খাইবার চেষ্টা যে আপনাকে করিতে হয়, আশ্রয়ের স্থানটুকু যে নিজেকে খুঁজিয়া লইতে হয়, কিংবা নিদ্রা এবং ক্ষুধার মাঝে যে একটু প্রভেদ আছে—এইখানে আসিয়া সে এইবার প্রথম শিক্ষা করিল।

কতদিন হইল, সে বাড়ী ছাড়িয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া শরীরটাও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে, অর্থও ফুরাইয়া আসিতেছে—বস্ত্রাদি মলিন এবং জীর্ণ হইতে চলিল, রাত্রে শুইয়া থাকিবার স্থানটুকুরও কোন ঠিকানা নাই—সুরেনের চক্ষে জল আসিল। বাটীতে পত্র লিখিতেও ইচ্ছা হয় না—বড় লজ্জা করে! এবং সকলের উপর যখন তাহার বিমাতার সেই স্নেহ-কঠিন মুখখানি মনে পড়ে, তখন বাটী যাইবার ইচ্ছা একেবারে আকাশ-কুসুম হইয়া দাঁড়ায়। সেখানে যে সে কখনও ছিল, এ কথা ভাবিতেও তাহার ভয় হয়।

একদিন সে তাহারই মত একজন দরিদ্রকে কাছে পাইয়া বলিল, "বাপু, তোমরা এখানে খাও কি করিয়া?"

লোকটা একরকম বোকা ধরণের—না হইলে উপহাস করিত! সে বলিল, "চাকরি করিয়া খাটিয়া খাই! কলিকাতায় রোজগারের ভাবনা কি?"

সুরেন্দ্র বলিল, "আমাকে একটা চাকরি করিয়া দিতে পার?"

সে কহিল, "তুমি কি কাজ জান?"

সুরেন্দ্রনাথ কোন কাজই জানিত না, তাই সে চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

"তুমি কি ভদ্রলোক?" সুরেন্দ্র মাথা নাড়িল।

"তবে লেখাপড়া শিখনি কেন?"

"শিখেছি।"

সে লোকটা একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে ঐ বড় বাড়ীতে যাও। ওখানে বড়লোক জমিদার থাকে—একটা কিছু করিয়া দিবেই।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ ফটকের কাছে আসিল। একবার দাঁড়াইল, আবার পিছাইয়া গেল, আবার ফিরিয়া আসিল—আবার গেল। সেদিন আর কিছু হইল না। পরদিনও ঐরূপ করিয়া কাটিল। দুই দিন ধরিয়া সে ফটকের নিকট উমেদারি করিয়া তৃতীয় দিবসে সাহস সঞ্চয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে একজন ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চান্?"

"বাবুকে—"

"বাবু বাড়ী নেই।"

সুরেন্দ্রনাথের বুকখানা আনন্দে ভরিয়া উঠিল—একটা নিতান্ত শক্ত কাজের হাত হইতে সে পরিত্রাণ পাইল। বাবু বাড়ী নাই! চাকরির কথা, দুঃখের কাহিনী বলিতে হইল না, ইহাই তাহার আনন্দের কারণ। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরিয়া গিয়া, দোকানে বসিয়া, পেট ভরিয়া খাবার খাইয়া, খানিকক্ষণ সে মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইল, এবং মনে মনে রীতিমত আলোচনা করিতে লাগিল যে, পরদিন কেমন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলে তাহার নিশ্চিত একটা কিনারা হইয়া যাইবে।

পরদিন কিন্তু উৎসাহটা তেমন রহিল না। বাটীর যত নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। ক্রমে ফটকের নিকট আসিয়া একেবারে সে দমিয়া পড়িল—পা আর কোন মতেই ভিতরে যাইতে চাহে না! আজ তাহার কিছুতেই মনে হইতেছে না যে, সে নিজের কাজের জন্যই নিজে আসিয়াছে—ঠিক মনে হইতেছিল, যেন জোর করিয়া আর কেহ তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দ্বারের কাছে সে আর উমেদারি করিবে না, তাই ভিতরে আসিল। সেই ভৃত্যটার সহিত দেখা হইল। সে বলিল, "বাবু বাড়ী আছেন, দেখা করিবেন কি?"

"হাঁ।"

"তবে চলুন।"

এটা আরও কঠিন। জমিদার বাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী। রীতিমত সাহেবী ধরণে সাজান আস্‌বাব-পত্র। কক্ষের পর কক্ষ, মারবেল-প্রস্তরের সোপানাবলী, ঝাড়-লণ্ঠন, লাল কাপড়ে ঢাকা প্রতি কক্ষে শোভা পাইতেছে, ভিত্তি-সংলগ্ন প্রকাণ্ড মুকুর—কত ছবি, কত

ফটোগ্রাফ্। এ সকল অপরের পক্ষে যাহাই হউক, সুরেন্দ্রর নিকট নূতন নহে। কারণ, তাহার পিতার বাটীও দরিদ্রের কুটীর নহে; আর যাহাই হউক, সে দরিদ্র পিতার আশ্রয়ে এত বড় হয় নাই। সুরেন্দ্র ভাবিতেছিল—সেই লোকটির কথা, যাহার সহিত দেখা করিতে, অনুনয়-বিনয় করিতে যাইতেছে,—তিনি কি প্রশ্ন করিবেন, এবং সে কি উত্তর দিবে!

কিন্তু এত ভাবিবার সময় নাই—কর্ত্তা সম্মুখে বসিয়াছিলেন; সুরেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিলেন, "কি প্রয়োজন?"

আজ তিন দিন ধরিয়া সুরেন্দ্র এই কথাই ভাবিতেছিল, কিন্তু এখন সব ভুলিয়া গেল,—বলিল, "আমি—আমি—"

ব্রজরাজ লাহিড়ী পূর্ব্ববঙ্গের জমিদার। মাথার দুই চারি গাছা চুলও পাকিয়াছে—বাতিকে নহে, ঠিক বয়সেই পাকিয়াছিল—বড়-লোক, অনেক দেখিয়াছিলেন—তাই চট্ করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে অনেকটা বুঝিয়া লইলেন, কহিলেন, "হাঁ বাপু, কি চাও তুমি?"

"কোন একটা—"

"কি একটা?"

"চাকরি—।" ব্রজরাজবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি চাকরি দিতে পারি, এ সংবাদ তোমাকে কে দিল?"

"পথে একজনের সহিত দেখা হইলে, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সেই আপনার কথা—"

"ভাল। তোমার বাড়ী কোথায়?"

"পশ্চিমে।"

"সেখানে কে আছে?" সুরেন্দ্রনাথ সব কথা বলিল।

"তোমার পিতা কি করেন ?"

অবস্থাবৈগুণ্যে সুরেন্দ্র নূতন ধাঁচ শিখিয়াছিল—একটু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, "সামান্য চাকরি করেন।"

"তাতে চলে না, তাই তুমি উপার্জ্জন করিতে চাও ?"

"হাঁ।"

"এখানে কোথায় থাক ?"

"কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই—যেখানে সেখানে।"

ব্রজবাবুর দয়া হইল ! সুরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া তিনি বলিলেন, "তুমি এখনও বালক মাত্র। এই বয়সে বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছ বলিয়া দুঃখ হইতেছে। আমি নিজে যদিও কোনও চাকরি করিয়া দিতে পারি না, কিন্তু যাহাতে কিছু যোগাড় হয়, তাহার উপায় করিয়া দিতে পারি।"

সুরেন্দ্রনাথ "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, ব্রজবাবু তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, "আর কিছু তোমার জিজ্ঞাসা করিবার নাই ?"

"না।"

"ইহাতেই তোমার কাজ হইয়া গেল ? কি উপায় করিতে পারি, কবে করিতে পারি—কিছুই জানিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিলে না ?"

সুরেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবাবু সহাস্যে বলিলেন, "এখন কোথায় যাইবে ?"

"কোন একটা দোকানে।"

"সেইখানেই আহার করিবে ?"

"প্রতিদিন তাহাই করি।"

"তুমি লেখাপড়া কতদূর শিখিয়াছ ?"

"কিছু শিখিয়াছি।"

"আমার ছেলেকে পড়াইতে পারিবে ?"

সুরেন্দ্র খুসি হইয়া কহিল, "পারিব।"

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন। তাঁহার মনে হইল, দুঃখে এবং দারিদ্র্যে তাহার মাথার ঠিক নাই! কেন না, কাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে, এবং কি শিক্ষা দিতে হইবে, এ কথা না জানিয়াই অতটা আনন্দিত হওয়া তাঁহার নিকটে পাগলামি বলিয়া বোধ হইল। বলিলেন, "যদি সে বলে, আমি বি, এ ক্লাসে পড়ি, তখন তুমি কি করিয়া পড়াইবে ?"

সুরেন্দ্র একটু গম্ভীর হইয়া ভাবিয়া বলিল, "তা এক রকম হইবে—"

ব্রজবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "বঙ্কু, এই বাবুটির থাকিবার জায়গা করিয়া দাও, এবং স্নানাহারের যোগাড় দেখ।" পরে সুরেন্দ্রর পানে চাহিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যার পর আবার ডাকাইয়া পাঠাইব—তুমি আমার বাড়ীতেই থাক। যতদিন কোন চাকরির উপায় না হয়, ততদিন স্বচ্ছন্দে এখানে থাকিতে পারিবে।"

দ্বিপ্রহরে আহার করিতে গিয়া তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধবীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "মা, একজন দুঃখী লোককে বাড়ীতে স্থান দিয়াছি।"

"কে, বাবা ?"

"দুঃখী লোক, এ ছাড়া আর কিছু জানি না। লেখাপড়া বোধ হয়, কিছু জানে, কেন না, তোমার দাদাকে পড়াইবার কথা বলাতে, তাহাতেই সে স্বীকার করিয়াছিল। বি, এ ক্লাসের ছেলেকে যে পড়াইতে সাহস করিতে পারে, অন্ততঃ তোমার ছোট বোন্‌টিকে সে নিশ্চয় পড়াইতে পারিবে। মনে করিতেছি সে-ই প্রমীলার মাষ্টার থাকুক।"

মাধবী আপত্তি করিল না।

সন্ধ্যার পর তাহাকে ডাকিয়া আনাইয়া, ব্রজবাবু তাহাই বলিয়া দিলেন। পরদিন হইতে সুরেন্দ্রনাথ প্রমীলাকে পড়াইতে লাগিল।

প্রমীলার বয়স সাত বৎসর। সে বোধোদয় পড়ে। বড়দিদি মাধবীর নিকট ফার্ষ্ট বুকের ভেকের গল্প পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। সে খাতাপত্র, বই, শ্লেট, পেন্সিল, ছবি লজেঞ্জেস্ প্রভৃতি আনিয়া পড়িতে বসিল।

Do not move, সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া দিল—"Do not move—নড়িও না।"

প্রমীলা পড়িতে লাগিল "Do not movo—নড়িও না।"

তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হইয়া শ্লেট টানিয়া লইল—পেন্সিল হাতে করিয়া আঁক পাড়িয়া বসিল। প্রব্লেমের পর প্রব্লেম সল্‌ভ্ হইতে লাগিল—ঘড়িতে সাতটার পর আটটা, তার পর নয়টা বাজিতে লাগিল। প্রমীলা কখনও এ পাশ, কখনও ও পাশ ফিরিয়া ছবির পাতা উল্টাইয়া শুইয়া বসিয়া লজেঞ্জেস্ মুখে পুরিয়া, নিরীহ ভেকের সর্ব্বাঙ্গ মসীলিপ্ত করিতে করিতে পড়িতে লাগিল, "Do not move—নড়িও না।"

"মাষ্টার মশায়, বাড়ী যাই ?"

"যাও !"

সকাল বেলাটা তাহার এইরূপেই কাটে। কিন্তু দুপুরবেলার কাজটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। চাকুরির যাহাতে উপায় হয়, এ জন্য ব্রজবাবু অনুগ্রহ করিয়া দুই-একজন ভদ্রলোকের নামে খানকতক পত্র দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এইগুলিকে পকেটে করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সন্ধান করিয়া তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখে, কত বড় বাড়ী, কয়টা জানালা, বাহিরে কতগুলি ঘর, দ্বিতল কি ত্রিতল, সম্মুখে কোন ল্যাম্প-পোষ্ট আছে কি না ! তাহার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আইসে।

কলিকাতায় আসিয়াই সে কতকগুলা পুস্তক ক্রয় করিয়াছিল, বাড়ী হইতেও কতকগুলা লইয়া আসিয়াছিল, এখন সেইগুলা সে গ্যাসের আলোকে অধ্যয়ন করিতে থাকে। ব্রজবাবু কাজকর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, হয় চুপ করিয়া থাকে, না হয়, বলে, ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজি চারি বৎসর হইল, ব্রজরাজবাবুর পত্নীবিয়োগ হইয়াছে—বুড়া বয়সের এ দুঃখ বুড়াতেই বোঝে। কিন্তু সে কথা যাউক—তাঁহার আদরের কন্যা মাধবী দেবী যে এই তার ষোল বৎসর বয়সেই স্বামী হারাইয়াছে—ইহাই ব্রজরাজের শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত শুষিয়া লইয়াছে। সাধ করিয়া ঘটা করিয়া তিনি মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন

নিজের অনেক টাকা,—তাই অর্থের প্রতি নজর দেন নাই, ছেলেটির বিষয়-আশয় আছে কি না, খোঁজ লন নাই, শুধু দেখিয়াছিলেন, ছেলেটি লেখাপড়া করিতেছে, রূপবান্, সৎ সাধুচরিত্র,—ইহাই লক্ষ্য করিয়া মাধবীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

এগারো বৎসর বয়সে মাধবীর বিবাহ হইয়াছিল। তিন বৎসর সে স্বামীর কাছে ছিল। যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা সবই সে পাইয়াছিল।

কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ বাঁচিলেন না। মাধবীর এ জীবনের সব সাধ মুছিয়া দিয়া, ব্রজরাজের বক্ষে শেল হানিয়া তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। মরিবার সময় মাধবী যখন বড় কাঁদিতে লাগিল, তখন তিনি মৃদু-কণ্ঠে কহিয়াছিলেন, "মাধবি, তোমাকে যে ছাড়িয়া যাইতেছি, এইটিই আমার সব চেয়ে দুঃখ। মরি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি যে আজীবন ক্লেশ পাইবে, এইটি আমাকে বড় বিচলিত করিয়াছে। তোমাকে যে যত্ন করিতে পাইলাম না—"

দরবিগলিত অশ্রুরাশি যোগেন্দ্রর শীর্ণ বক্ষে ঝরিয়া পড়িল। মাধবী তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, আবার যখন তোমার পায়ে গিয়া পড়িব, তখন যত্ন করিয়ো—"

যোগেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "মাধবি, যে জীবন তুমি আমার সুখের জন্য সমর্পণ করিতে, সেই জীবন সকলের সুখে সমর্পণ করিও। যার মুখ ক্লিষ্ট মলিন দেখিবে, তাহারই মুখ প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিও—আর কি বলিব, মাধবি—" আবার উচ্ছসিত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল—মাধবী তাহা মুছাইয়া দিল।

"সৎপথে থাকিও—তোমার পুণ্যে আবার তোমাকে পাইব।"

সেই অবধি মাধবী একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ক্রোধ,

হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি যাহা কিছু তাহার ছিল, স্বামীর চিতাভস্মের সহিত সবগুলি সে ইহজন্মের মত গঙ্গার জলে উড়াইয়া দিয়াছে। এ জীবনের কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা! বিধবা হইলে কিছু সে সব যায় না—মাধবী তখন স্বামীর কথা ভাবে। তিনি যখন নাই, তখন আর কেন? কাহার জন্য আর পরের হিংসা করিব! কাহার জন্য আর পরের চক্ষে জল বহাইব! আর এ সকল হীন প্রবৃত্তি তাহার কোন কালেই ছিল না; বড় লোকের মেয়ে—কোন সাধ, কোন আকাঙ্ক্ষাই তাহার অতৃপ্ত ছিল না—হিংসা-দ্বেষ সে কোন দিন শিখেও নাই।

তাহার নিজের হৃদয়ে অনেক ফুল ফোটে, আগে সে ফুলে মালা গাঁথিয়া সে স্বামীর গলায় পরাইয়া দিত। এখন স্বামী নাই, তাই বলিয়া ফুলগাছটি সে কাটিয়া ফেলে নাই। এখনো তাহাতে তেমনি ফুল ফোটে, ভূমে লুটাইয়া পড়ে। এখন সে আর মালা গাঁথিতে যায় না সত্য, কিন্তু গুচ্ছ করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া দীন-দুঃখীকে তাহা বিলাইয়া দেয়। যাহার নাই, তাহাকেই দেয়, এতটুকু কার্পণ্য নাই, এতটুকু মুখ ভারি করা নাই।

ব্রজবাবুর গৃহিণী যেদিন পরলোক-গমন করেন, সেই দিন হইতে এ সংসারে আর শৃঙ্খলা ছিল না। সবাই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত; কেহ কাহাকে দেখিত না, কেহ কাহারো পানে চাহিত না। সকলেরই এক একজন ভৃত্য মোতায়েন ছিল, তাহারা আপন আপন প্রভুর কাজ করিত। রন্ধন-শালায় পাচক রন্ধন করিত, বৃহৎ অন্নসত্রের মত লোকে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাইত। কেহ খাইতে পাইত, কেহ পাইত না। সে দুঃখ কেহ চাহিয়াও দেখিত না।

কিন্তু যেদিন হইতে মাধবী তাহার ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গার মত রূপ, স্নেহ, মমতা লইয়া পিতৃ-ভবনে ফিরিয়া আসিল, সেইদিন হইতে যেন সমস্ত সংসারে নবীন বসন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন সবাই কহে, বড়দিদি, সবাই বলে মাধবী। বাড়ীর পোষা কুকুরটা পর্য্যন্ত দিনান্তে একবার বড়দিদিকে দেখিতে চাহে! এত লোকের মধ্যে সেও যেন একজনকে স্নেহময়ী সর্ব্বময়ী বলিয়া বাছিয়া রাখিয়াছে। বুড়ীর প্রভু হইতে সরকার, গোমস্তা, দাস, দাসী সবাই ভাবে, বড়-দিদির কথা, সবাই তাহার উপর নির্ভর করে; সকলেরই মনে মনে একটা ধারণা যে, যে কারণেই হউক, এই বড়দিদিটির উপর তাহার একটু বিশেষ দাবী আছে।

স্বর্গের কল্পতরু কখনও দেখি নাই, দেখিব কি না তাহাও জানি না, সুতরাং তাহার কথা বলিতেও পারিলাম না! কিন্তু এই ব্রজ-বাবুর সংসারবর্ত্তী লোকগুলা একটি কল্পতরু পাইয়াছিল। তলায় গিয়া হাত পাতিত, আর হাসিমুখে ফিরিয়া আসিত।

এরূপ পরিবারের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ একটা নূতন ধরণের জীবন অতিবাহিত করিবার উপায় দেখিতে পাইল। সকলে যখন এক-জনেরই উপর সমস্ত ভার রাখিয়াছে, তখন সেও তাহাদের মতই করিতে লাগিল। কিন্তু অপরের অপেক্ষা তাহার ধারণা একটু ভিন্ন প্রকারের। সে ভাবিত, বড়দিদি বলিয়া একটি জীবন্ত পদার্থ বাটীর মধ্যে থাকে, সকলকে দেখে, সব আবদার-সহ্য করে, যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা তাহারই নিকট পাওয়া যায়। কলিকাতার রাজ-পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের জন্য নিজে ভাবিবার প্রয়োজনটা সে কতক বুঝিয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি সে একেবারে

ভুলিয়া গেল যে, আপনার জন্য তাহাকে বিগত জীবনের কোন একটি দিনও ভাবিতে হইয়াছিল, বা পরে ভাবিতে হইবে!

জামা, কাপড়, জুতা, ছাতি, ছড়ি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই তাহার কক্ষে প্রচুর আছে। রুমালটি পর্য্যন্ত তাহার জন্য সযত্নে কে যেন সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। প্রথমে কৌতূহল হইত, সে জিজ্ঞাসা করিত, "এ সব কোথা হইতে আসিল?" উত্তর পাইত, "বড়দিদি পাঠাইয়া দিয়াছেন।" জলখাবারের থালাটি পর্য্যন্ত দেখিলে সে আজকাল বুঝিতে পারে, ইহাতে বড়দিদির সযত্নস্পর্শ ঘটিয়াছে।

অঙ্ক কষিতে বসিয়া একদিন তাহার কম্পাসের কথা মনে পড়িল,—প্রমীলাকে কহিল, "প্রমীলা! বড়দিদির কাছ থেকে কম্পাস নিয়ে এস।"

কম্পাস লইয়া বড়দিদিকে কাজ করিতে হয় না, ইহা তাহার নিকট ছিল না; কিন্তু বাজারে তখনই সে লোক পাঠাইয়া দিল। সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া আসিয়া সুরেন্দ্রনাথ দেখিল, তাহার টেবিলের উপর প্রার্থিত বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে। পরদিন সকালে প্রমীলা কহিল, "মাষ্টার-মহাশয়, কাল দিদি ঐটে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

তাহার পর মধ্যে মধ্যে সে এমন এক-আধটা জিনিস চাহিয়া বসিত যে, মাধবী সেজন্য বিপদে পড়িয়া যাইত। অনেক অনুসন্ধান করিয়া তবে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইত। কিন্তু কখনও সে বলে নাই, "দিতে পারিব না!"

কিংবা কখনও সে হঠাৎ হয়ত প্রমীলাকে কহিল, বড়দিদির নিকট হইতে পাঁচখানা পুরাতন কাপড় লইয়া এস; ভিখারীদের দিতে হইবে। নূতন পুরাতন বাছিবার অবসর মাধবীর সব সময়

থাকিত না ; সে আপনার পাঁচখানা কাপড় পাঠাইয়া দিয়া, উপরের গবাক্ষ হইতে দেখিত—চারি-পাঁচজন দুঃখী লোক কলরব করিতে করিতে ফিরিয়া যাইতেছে—তাহারাই বস্ত্রলাভ করিয়াছে !

সুরেন্দ্রনাথের এই ছোট-খাট আবেদন-অত্যাচার নিত্যই মাধবীকে সহ্য করিতে হইত। ক্রমশঃ এ সকল এরূপ অভ্যাস হইয়া গেল যে মাধবীর আর মনে হইত না, একটা নূতন জীব তাহার সংসারে আসিয়া দৈনন্দিন কার্য্য-কলাপের মাঝখানটিতে নূতন রকমের ছোট-খাট উপদ্রব তুলিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে ! এই নূতন জীবটির জন্য মাধবীকে আজকাল খুবই সতর্ক থাকিতে হয়, বড় বেশী খোঁজ লইতে হয়। সে যদি সব জিনিস চাহিয়া লইত, তাহা হইলেও মাধবীর অর্দ্ধেক পরিশ্রম কমিয়া যাইত, সে যে নিজের কোন জিনিসই চাহে না—এইটিই বড় ভাবনার কথা। প্রথমে সে জানিতে পারে নাই যে, সুরেন্দ্রনাথ নিতান্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক ! প্রাতঃকালে চা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, সে হয় ত খায় না ! জলখাবার হয় ত স্পর্শ করিতেও তাহার মনে থাকে না, হয় ত বা কুকুরের মুখে তুলিয়া দিয়া সে চলিয়া যায়। খাইতে বসিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনের সে কোন সম্মানই রাখে না, পাশে ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া সরাইয়া রাখিয়া যায় ; যেন কোন দ্রব্যই তাহার মনে ধরে না! ভৃত্যেরা আসিয়া কহে, "মাষ্টারবাবু পাগলা, কিছু দেখে না, কিছু জানে না—বই নিয়েই ব'সে আছে।"

ব্রজবাবু মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন, চাকরির কোনরূপ সুবিধা হইতেছে কি না ! সুরেন্দ্র সে কথার ভাসা ভাসা উত্তর দেয়। মাধবী পিতার নিকট সে সব শুনিতে পায়, সে-ই কেবল বুঝিতে

পারে যে, চাকরির জন্য মাষ্টারবাবুর একতিল উদ্যোগ নাই, ইচ্ছাও নাই! যাহা আপাততঃ পাইয়াছে, তাহাতেই সে পরম সন্তুষ্ট।

বেলা দশটা বাজিলেই বড়দিদির নিকট হইতে স্নানাহারের তাগিদ আসে। ভাল করিয়া আহার না করিলে বড়দিদির হইয়া প্রমীলা অনুযোগ করিয়া যায়। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বই লইয়া বসিয়া থাকিলে ভৃত্যেরা গ্যাসের চাবি বন্ধ করিয়া দেয়, বারণ করিলে শুনে না—বলে, "বড়দিদির হুকুম।"

একদিন মাধবী পিতার কাছে হাসিয়া বলিল, "বাবা, প্রমীলা যেমন, তার মাষ্টারও ঠিক তেমনি।"

"কেন মা?"

দু'জনেই ছেলে-মানুষ। প্রমীলা যেমন বোঝে না, তার কখন্ কি দরকার, কখন্ কি খাইতে হয়, কখন্ শুইতে হয়, কখন্ কি করা উচিত, তার মাষ্টারও সেই রকম, নিজের কিছুই বোঝে না—অথচ অসময়ে এমনি জিনিষ চাহিয়া বসে যে, জ্ঞান হইলে, তাহা আর কেহ চাহে না।"

ব্রজবাবু বুঝিতে পারিলেন না। মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

মাধবী হাসিয়া বলিল, "তোমার মেয়েটি বোঝে, কখন্ তার কি দরকার?"

"তা' বোঝে না?"

"অথচ অসময়ে উৎপাত করে ত?"

"তা করে।"

"মাষ্টারবাবু তাই করে—"

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ছেলেটি বোধ হয়, একটু পাগল।"

"পাগল নয়। উনি বোধ হয় বড়লোকের ছেলে।"

ব্রজবাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া জানিলে ?"

মাধবী জানিত না, কিন্তু এমনি বুঝিত। সুরেন্দ্র যে নিজের একটি কাজও নিজে করিতে পারে না, পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, পরে করিয়া দিলে হয়, না করিয়া দিলে হয় না—এই অক্ষমতাই তাহাকে মাধবীর নিকট ধরাইয়া দিয়াছিল। তাহার মনে হইত—এটা তাহার পূর্ব্বের অভ্যাস। বিশেষ এই নূতন ধরণের আহার-প্রণালীটা মাধবীকে আরো চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে। কোন খাদ্যদ্রব্যই যে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না, কিছুই সে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করে না—কোনটির উপরই স্পৃহা নাই, এই বৃদ্ধের মত বৈরাগ্য, অথচ বালকের ন্যায় সরলতা, পাগলের মত [illegible]—[illegible] দিলে খায়, না দিলে খায় না—এ সকল তাহার নিকট বড় রহস্যময় বোধ হইত; একটা অজ্ঞাত করুণা-চক্ষুও, সেই জন্য এই অজ্ঞাত মাষ্টারবাবুর উপর পড়িয়াছিল। সে যে লজ্জা করিয়া চাহে না, তাহা নহে, তাহার প্রয়োজন হয় না, তাই সে চাহে না। যখন প্রয়োজন হয়, তখন কিন্তু আর সময়-অসময় থাকে না—একেবারে বড়দিদির নিকট আবেদন আসিয়া উপস্থিত হয়। মাধবী মুখ টিপিয়া হাসে, মনে হয়, এ লোকটি নিতান্ত বালকেরই মত সরল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনোরমা মাধবীর বাল্যকালের সখী, তাহাকে বহুদিন পত্র লেখা হয় নাই, উত্তর না পাইয়া সে বিষম চটিয়া গিয়াছিল। আজ দ্বিপ্রহরের পর একটু সময় করিয়া, মাধবী তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছিল। এমন সময় প্রমীলা আসিয়া ডাকিল, "বড়দিদি!" মাধবী মুখ তুলিয়া কহিল, "কি?"

"মাষ্টার-মহাশয়ের চশমা কোথায় হারিয়ে গেছে—একটা চশমা দাও।" মাধবী হাসিয়া ফেলিল। "তোমার মাষ্টার-মশায়কে বলগে, আমি কি চশমার দোকান করি?" প্রমীলা ছুটিয়া যাইতেছিল। মাধবী তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল, কোথায় যাচ্ছিস্?"

"বল্‌তো।"

"তার চেয়ে সরকার-মশায়কে ডেকে নিয়ে আয়।" প্রমীলা সরকার-মশায়কে ডাকিয়া আনিলে, মাধবী বলিয়া দিল—"মাষ্টার-বাবু চশমা হারিয়েছে, ভাল দেখে একটা কিনে দাওগে।"

সরকার চলিয়া গেলে, সে মনোরমাকে পত্র লিখিল, শেষে লিখিয়া দিল—

"প্রমীলার জন্য, বাবা একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন—তাহাকে মানুষ বলিলেও হয়, ছোট ছেলে বলিলেও হয়। আমার বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে, সে কখনও বাটীর বহির হয় নাই—সংসারের কিছুই জানে না। তাহাকে না দেখিলে, না তত্ত্ব লইলে তাহার এক দণ্ডও চলে না—আমার অর্দ্ধেক সময়, সে কাড়িয়া

লইয়াছে,—তোমাদের পত্র লিখিব আর কখন্? এখন যদি তোমার শীঘ্র আসা হয়, তাহা হইলে, এই অকর্ম্মণ্য লোকটাকে দেখাইয়া দিব। এমন অকেজো, অন্যমনস্ক লোক, তুমি জন্মে দেখ নাই। খেতে দিলে খায়, না দিলে চুপ করিয়া উপবাস করে। হয় ত সমস্ত দিনের মধ্যে, তাহার মনেও পড়ে না যে, তাহার আহার হইয়াছে কি না! একদিনের জন্যও সে আপনাকে চালাইয়া লইতে পারে না। তাই ভাবি, এমন লোক সংসারে বাহির হয় কেন! শুনিতে পাই, তাঁহার মাতাপিতা আছেন—কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁদের পাথরের মত শক্ত প্রাণ! আমি ত বোধ হয়, এমন লোককে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতাম না!"

মনোরমা তামাসা করিয়া উত্তর লিখিল,—"তোমার পত্রে অন্যান্য সংবাদের মধ্যে জানিতে পারিলাম যে, তুমি বাড়ীতে একটি বাঁদর পুষিয়াছ,—আর তুমি তার সীতা-দেবী হইয়াছ। কিন্তু তবু একটু সাবধান করিয়া দিতেছি। ইতি মনোরমা।"

পত্র পড়িয়া মাধবীর মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে উত্তর লিখিল,—"তোমার পোড়া-মুখ, তাই কাহাকে কি ঠাট্টা করিতে হয়, জানো না।"

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "প্রমীলা তোমার মাষ্টার-মশায়ের চশমা কেমন হয়েচে?"

প্রমীলা বলিল, "বেশ।"

"কেমন ক'রে জান্‌লে?"

"মাষ্টার-মশায়, সেই চশমা চোখে দিয়ে, বেশ বই পড়েন—তাই জান্‌লুম।"

মাধবী কহিল, "তিনি নিজে কিছু বলেননি ?"

"কিছু না।"

"একটি কথাও না ? ভাল হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে, কিছু না ?"

"না, কিছু না।"

মাধবীর সদা-প্রফুল্ল মুখ যেন মুহূর্ত্তের জন্য মলিন হইল ;—কিন্তু তখনি হাসিয়া কহিল, "তোমার মাষ্টারকে বলে দিয়ো, তিনি যেন আর হারিয়ে না ফেলেন।"

"আচ্ছা, বলে দেব।"

"দূর্ পাগলি, তা কি বল্‌তে আছে ! তিনি হয় ত, কিছু মনে কর্‌বেন।"

"তবে কিছুই বল্‌ব না ?"

"না।"

শিবচন্দ্র মাধবীর দাদা। মাধবী একদিন তাহাকে ধরিয়া বলিল, "দাদা, প্রমীলার মাষ্টার রাতদিন কি পড়ে, জান ?"

শিবচন্দ্র বি, এ ক্লাসে পড়ে ; ক্ষুদ্র প্রমীলার শিক্ষক-শ্রেণীর লোকগুলা, তাহার গ্রাহ্যের মধ্যেই নহে। উপেক্ষা করিয়া বলিল, "নাটক নভেল পড়ে, আর কি পড়িবে ?" মাধবীর বিশ্বাস হইল না। প্রমীলাকে দিয়া একখানা পুস্তক লুকাইয়া আনিয়া দাদার হাতে দিয়া বলিল, নাটক নভেল ব'লে ত বোধ হয় না।"

শিবচন্দ্র আগাগোড়া দেখিয়া কিছু বুঝিল না, শুধু এইটুকু বুঝিল যে, ইহার এক বিন্দুও তাহার জানা নাই এবং এখানি গণিতের পুস্তক।

ভগিনীর নিকট সম্মান হারাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

কহিল, "এটা অক্ষর বই ; ইস্কুলে নীচের ক্লাসে পড়া হয়।" বিষণ্ণ-মুখে মাধবী প্রশ্ন করিল, "কোন পাশের পড়া নয়? কলেজের বই নয়?"

শুষ্ক হইয়া শিবচন্দ্র বলিল, "না, কিছুই নয়। কিন্তু সেইদিন হইতে শিবচন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক কখন সুরেন্দ্রর সম্মুখে পড়িত না। মনে মনে ভয় ছিল, পাছে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, পাছে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং পিতার আদেশে, তাহাকে প্রাতঃকালটা প্রমীলার সহিত একসঙ্গে এই মাষ্টারটার নিকট খাতা পেন্‌সিল লইয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

কিছুদিন পরে মাধবী পিতাকে কহিল, "বাবা, আমি দিন-কতকের জন্য কাশী যাব।"

ব্রজবাবু চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, "সে কি মা? তুমি কাশী গেলে এ সংসারের কি হইবে?" মাধবী হাসিয়া বলিল, "আমি আবার ত আসিব, একেবারে যাইতেছি না ত।"

মাধবী হাসিল। পিতার চক্ষে কিন্তু জল আসিতেছিল। মাধবী বুঝিতে পারিল, এরূপ কথা বলা অন্যায় হইয়াছে। সামলাইয়া লইবার জন্য কহিল, "শুধু দিনকতকের জন্য বেড়াইয়া আসিব।"

"তা যাও—কিন্তু মা, সংসার চল্‌বে না।"

"আমি ছাড়া সংসার চল্‌বে না?"

"চল্‌বে না কেন মা, চল্‌বে! হাল ভাঙ্গিয়া গেলে স্রোতের মুখে নৌকাখানা যেমন ক'রে চলে—এও তেমনি চল্‌বে।"

কিন্তু কাশী যাওয়া তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। সেখানে তাহার

বিধবা ননদিনী, একমাত্র পুত্র লইয়া বাস করেন; তাঁহাকে একবার দেখিতে হইবে।

কাশী যাইবার দিন, সে প্রত্যেককে ডাকিয়া, সংসারের ভার দিয়া গেল। বুড়ী দাসীকে ডাকিয়া, পিতা, দাদা ও প্রমীলাকে বিশেষরূপে দেখিবার জন্য অনুরোধ ও উপদেশ দিয়া দিল; কিন্তু মাষ্টারের কথা কাহাকেও কহিল না! ভুলিয়া যায় নাই—ইচ্ছা করিয়াই বলিল না। সম্প্রতি তাহার উপর একটু রাগ হইয়াছিল। মাধবী তাহার জন্য অনেক করিয়াছে, কিন্তু এখন সে একটা মুখের কথাতেও কৃতজ্ঞতা জানায় নাই। তাই মাধবী বিদেশে গিয়া এই অকর্ম্মণ্য সংসারানভিজ্ঞ উদাসীনটিকে জানাইতে চাহে যে, সে একজন ছিল। একটা কৌতুক করিতে দোষ কি? সে-না থাকিলে ইহার কেমনভাবে দিন কাটে, দেখিতে হানি কি? তাই সে সুরেন্দ্রর সম্বন্ধে, কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না।

সুরেন্দ্রনাথ প্রব্‌লেম্ সল্‌ভ্ করিতেছিল। প্রমীলা কহিল, "কাল রাত্রে দিদি কাশী গিয়াছেন।" কথাটা তাহার কাণে গেল না। কিন্তু দিন-দুই-তিন পরে যখন সে দেখিতে পাইল, দশটার সময় আহারের জন্য আর পীড়াপীড়ি হয় না,—কোন দিন বা একটা দুইটা বাজিয়া যায়; স্নানান্তে কাপড় ছাড়িতে গিয়া, বোধ হয়, সেগুলি আর তেমন পরিষ্কার নাই, জলখাবারের থালাটা তেমন সযত্ন সজ্জিত নহে। রাত্রে গ্যাসের চাবি কেহ বন্ধ করিতে আসে না, পড়ার ঝোঁকে দুইটা তিনটা বাজিয়া যায়। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হয় না, উঠিতে বেলা হয়, সমস্ত দিন চোখের পাতা ছাড়িয়া ঘুম কিছুতেই যাইতে চাহে না। শরীর যেন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে,

তখন সুরেন্দ্রনাথের মনে হইল, এ সংসারের একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গরম বোধ হইলে, তবে লোকে পাখার সন্ধান করে। সুরেন্দ্রনাথ পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া কহিল,—

"প্রমীলা, বড়দিদি এখানে নাই, না ?"

সে বলিল, "দিদি কাশী গিয়াছেন।"

"তাই ত !"

দিন দুই পরে হঠাৎ প্রমীলার পানে চাহিয়া সে কহিল, "বড়-দিদি কবে আসিবেন ?"

"একমাস পরে !"

সুরেন্দ্রনাথ পুস্তকে মনোযোগ করিল। আরও পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ পেন্সিলটা পুস্তকের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, "প্রমীলা, এক মাসের আর কত বাকি ?" "অনেক দিন।" পেন্সিল তুলিয়া লইয়া সুরেন্দ্র চশমা খুলিয়া কাচ দুইটা পরিষ্কার করিল। তাহার পর চক্ষে দিয়া পুস্তকের পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিন কহিল, "প্রমীলা, বড়দিদিকে তুমি চিঠি লেখ না ?"

"লিখি বই কি।"

"তাড়াতাড়ি-আসতে লেখনি ?"

"না।" সুরেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তাই ত।"

প্রমীলা বলিল, "মাষ্টার-মশায়, বড়দিদি এলে বেশ হয়, না ?"

"বেশ হয়।"

"আসতে লিখে দেবো ?"

সুরেন্দ্রনাথ প্রফুল্ল হইয়া বলিল, "দাও।"

"আপনার কথা লিখে দেবো?"

"দাও।"

'দাও' বলিতে তাহার কোনরূপ দ্বিধাবোধ হইল না। কেন না জগতের কোন আদব-কায়দা সে জানিত না। বড়দিদিকে আসিবার জন্য অনুরোধ করা যে তাহার মানায় না, ভাল শুনিতে হয় না, এটা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না। যে না থাকিলে, তাহার বড় ক্লেশ হয়, যাহার অবর্ত্তমানে তাহার চলিতেছে না—তাহাকে আসিতে বলায় সে কিছুই অসঙ্গত মনে করিল না।

এ জগতে যাহার কৌতূহল কম, সে সাধারণ মনুষ্য সমাজের একটু বাহিরে। যে দলে সাধারণ মনুষ্য বিচরণ করে, সে দলে তাহার মেলা চলে না; সাধারণের মতামত তাহার মতামতের সহিত মিশ খায় না। কৌতূহলী হওয়া সুরেন্দ্রের স্বভাব নহে। যতটা তাহার প্রয়োজন, ততটাই সে জানিতে চাহে, তাহার বাহিরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক পদও যাইতে তাহার ইচ্ছা হইত না, সময়ও পাইত না। তাই বড়দিদির সম্বন্ধে, সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল। এতদিন এ সংসারে তাহার অতিবাহিত হইল, এই তিন মাস ধরিয়া, সে বড়দিদির উপর ভর দিয়া পরম আরামে কাটাইয়া দিয়াছে; কিন্তু কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই, এই জীবটি কেমন। কত বড়, কত বয়স, কেমন দেখিতে, কত গুণ, কিছুই সে জানিত না; জানিবার বাসনা হয় নাই, একবার মনেও পড়ে নাই। ইহার সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেও ত লোকের সাধ হয়!

সবাই কহে, বড়দিদি, সেও কহে, বড়দিদি! সবাই তাহার

নিকট স্নেহ যত্ন পায়, সেও পায়। বিশ্বের ভাণ্ডার তাহার নিকট গচ্ছিত আছে, যে চাহে, সে পায়—সুরেন্দ্রও লইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা আর কি? মেঘের কাজ, জল বরিষণ করা, বড়দিদির কাজ, স্নেহ-যত্ন করা। যখন বৃষ্টি পড়ে, তখন যে হাত পাতে, সেই জল পায়;—বড়দিদির নিকট হাত পাতিলে অভীষ্ট-পদার্থ পাওয়া যায়। মেঘের মতই বুঝি সে অন্ধ, কামনা এবং আকাঙ্ক্ষাহীন! মোটের উপর সে এমনি একটা ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল। আসিয়া অবধি সে যে ধারণা গড়িয়া রাখিয়াছিল—আজও তাহাই আছে, শুধু এই কাশী গমন ঘটনাটির পর হইতে এইটুকু সে বেশী জানিয়াছে যে, এই বড়দিদি ভিন্ন তাহার এক দণ্ডও চলিতে পারে না।

সে যখন বাড়ীতে ছিল তখন তাহার পিতাকে জানিত, বিমাতাকে জানিত। তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিত, কিন্তু বড়দিদি বলিয়া কাহারো সহিত পরিচিত হয় নাই—যখন পরিচয় হইয়াছে, তখন সে এমনই বুঝিয়াছে। কিন্তু মানুষটিকে সে চিনে না, জানে না, শুধু নামটি জানে, নামটি চিনে, লোকটি তাহার কেহ নহে। নামটি সর্ব্বস্ব!

লোকে যেমন ইষ্ট-দেবতাকে দেখিতে পায় না, শুধু নামটি শিখিয়া রাখে, দুঃখে কষ্টে সেই নামটির সম্মুখে সমস্ত হৃদয় মুক্ত করে, নতজানু হইয়া করুণাভিক্ষা চাহে, চক্ষে জল আসে, মুছিয়া ফেলিয়া শূন্য-দৃষ্টিতে কাহাকে যেন দেখিতে চাহে—কিছুই দেখা যায় না; অস্পষ্ট জিহ্বা শুধু দুটি কথা অস্ফুটে উচ্চারণ করিয়া থামিয়া যায়। দুঃখ পাইয়া তাই সুরেন্দ্রনাথও অস্ফুটে উচ্চারণ করিল, "বড়দিদি!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখনো সূর্য্যোদয় হয় নাই, পূর্ব্বদিক্ রঞ্জিত হইয়াছে মাত্র! প্রমীলা আসিয়া নিদ্রিত সুরেন্দ্রনাথের গলা জড়াইয়া ধরিল,—"মাষ্টার-মশায়।" সুরেন্দ্রনাথের অলস চক্ষু দুটী ঈষৎ উন্মুক্ত হইল,—"কি প্রমীলা?"

"বড়দিদি এসেছেন।" সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া বসিল। প্রমীলার হাত ধরিয়া বলিল, "চল, দেখে আসি।"

এই দেখিবার বাসনাটি, তাহার মনে কেমন করিয়া উদয় হইল, বলা যায় না, এবং এতদিন পরে কেন যে সে প্রমীলার হাত ধরিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিল, তাহাও বুঝিতে পারা গেল না; কিন্তু সে ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। মাধবীর কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "বড়দিদি!"

বড়দিদি অন্যমনস্ক হইয়া কি একটা কাজ করিতেছিল, কহিল, "কি দিদি?"

"মাষ্টার-মশাই—"

দুইজনে ততক্ষণে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, মাধবী শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল। মাথার উপর এক হাত কাপড় টানিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সুরেন্দ্রনাথ কহিতেছিল, "বড়দিদি, তোমার জন্ম আমি বড় কষ্টে—" মাধবী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বিষম লজ্জায় জিভ কাটিয়া মনে মনে বলিল, "ছি ছি!"

"তুমি চলে গেলে—"

মাধবী মনে মনে বলিল, "কি লজ্জা!"

মাধবী মৃদু-কণ্ঠে কহিল, "প্রমীলা, মাষ্টারমশায়কে বাহিরে যাইতে বল্।"

প্রমীলা ছোট হইলেও তাহার দিদির আচরণ দেখিয়া বুঝিতেছিল যে, কাজটা ঠিক হয় নাই। বলিল, "চলুন, মাষ্টারমশায়—"

অপ্রতিভের মত কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "চল।" বেশী কথা সে কহিতে জানিত না, বেশী কথা বলিতে সে চায় নাই, তবে সারাদিন মেঘের পর সূর্য্য উঠিলে, হঠাৎ যেমন লোকে সে দিকে চাহিতে যায়, ক্ষণকালের জন্য যেমন মনে থাকে না যে সূর্য্যের পানে চাহিতে নাই, কিংবা চাহিলে চক্ষু পীড়িত হয়, তেমনি একমাস মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে থাকিয়া প্রথম সূর্য্যোদয়ের সহিত, সুরেন্দ্রনাথ পরম আহ্লাদে চাহিয়া দেখিতে গিয়াছিল, কিন্তু ফল যে এরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সে জানিত না।

সেইদিন হইতে তাহার যত্নটা একটু কমিয়া আসিল। মাধবী যেন একটু লজ্জা করিত। বিন্দু দাসী না কি কথাটা লইয়া একটু হাসিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথও একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। আজকাল সে যেন দেখিতে পায়, তাহার বড়দিদির অসীম ভাণ্ডার সসীম হইয়াছে। ভগিনীর যত্ন জননীর স্নেহ-পরশ, যেন তাহার আর গায় লাগে না, একটু দূরে-দূরে থাকিয়া সরিয়া যায়।

একদিন সে প্রমীলাকে কহিল, "বড়দিদি আমার উপর রাগ করেচেন, না?"

প্রমীলা বলিল, "হাঁ?"

"কেন রে ?"

"আপনি অমন ক'রে বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলেন কেন ?"

"যেতে নেই, না ?"

"তা কি যেতে হয় ? দিদি খুব রাগ করেছে।"

সুরেন্দ্র পুস্তকখানা বন্ধ করিয়া বলিল, "তাই ত—।"

তার পর একদিন দুপুরবেলা মেঘ করিয়া বড় জল আসিল। ব্রজরাজবাবু আজ দুদিন হইল বাড়ী নাই; জমিদারি দেখিতে গিয়াছিলেন। মাধবীর হাতে কিছু কাজ ছিল না; প্রমীলাও বড় উপদ্রব করিতেছিল, মাধবী তাহাকে ধরিয়া, কহিল, "প্রমীলা তোর বই নিয়ে আয়, দেখি কত পড়েচিস্।"

প্রমীলা একেবারে কাঠ হইয়া গেল। মাধবী বলিল, "নিয়ে আয়।"

"বড়দিদি, রাত্তিরে আন্‌ব—"

"না এক্ষণি আন্।" নিতান্ত দুঃখিত-মনে তখন সে বই আনিতে গেল। আনিয়া বলিল, "মাষ্টারমশাই কিছুই পড়ায়নি—খালি আপনি পড়ে।" মাধবী জিজ্ঞাসা করিতে বসিল। আগাগোড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিল যে, সত্যই মাষ্টারমশায় কিছুই পড়ান নাই; অধিকন্তু সে যাহা শিখিয়াছিল, শিক্ষক নিযুক্ত করার পর, এই তিন চারি মাস ধরিয়া বেশ ধীরে ধীরে, সবটুকু ভুলিয়া গিয়াছে। মাধবী বিরক্ত হইয়া বিন্দুকে ডাকিয়া কহিল, "বিন্দু, মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা ক'রে আয় ত, কেন প্রমীলাকে এতদিন একটুও পড়াননি।"

বিন্দু যখন জিজ্ঞাসা করিতে গেল, মাষ্টার তখন "প্রব্লেম্"

ভাবিতেছিল। বিন্দু কহিল, "মাষ্টারমশায়, বড়দিদি বল্‌চেন যে, আপনি ছোটদিদিকে কিছু পড়ান নি কেন? মাষ্টার-মহাশয় শুনিতে পাইল না। এবার বিন্দু জোরে বলিল, "মাষ্টারমশায়?"

"কি?"

"বড়দিদি বল্‌চেন—"

"কি বলেচেন?"

"ছোটদিদিকে পড়ান্‌নি কেন?

অন্যমনস্ক হইয়া সে জবাব দিল—"ভাল লাগে না।"

বিন্দু ভাবিল, মন্দ নয়। একথা সে মাধবীকে জানাইল। মাধবীর রাগ হইল, সে নীচে আসিয়া দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া বিন্দুকে দিয়া বলাইল, "ছোট দি'দিকে একেবারে পড়ান্‌নি কেন?" কথাটা বার দুই তিন জিজ্ঞাসা করার পরে, সুরেন্দ্রনাথ কহিল, "আমি পার্‌ব না।"

মাধবী ভাবিল, এ কেমন কথা!

বিন্দু বলিল, "তবে আপনি কি জন্য আছেন?"

"না থাক্‌লে কোথা যাব।"

"তবে পড়ান না কেন?"

সুরেন্দ্রনাথের এবার চৈতন্য হইল। ফিরিয়া বসিয়া কহিল, "কি বল্‌চ?" বিন্দু এতক্ষণ ধরিয়া কি কহিতেছিল, তাহাই আবার আবৃত্তি করিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন কহিল, "সে ত রোজ পড়ে!"

"পড়ে, কিন্তু আপনি দেখেন কি?"

"না। আমার সময় হয় না।"

"তবে এ বাড়ীতে কেন আছেন?" সুরেন্দ্র চুপ করিয়া তাহা ভাবিতে লাগিল।

"আপনি আর পড়াতে পার্‌বেন না ?"

"না। আমার পড়াতে ভাল লাগে না।"

মাধবী ভিতর হইতে কহিল, "জিজ্ঞাসা কর বিন্দু, কেন এতদিন তবে মিছা কথা ব'লে এখানে আছেন ?" বিন্দু তাহাই কহিল। শুনিয়া সুরেন্দ্রর "প্রব্‌লেমের" জাল একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল; একটু দুঃখিত হইল, একটু ভাবিয়া বলিল, "তাই ত, বড় ভুল হয়েচে।"

"এই চার মাস ধ'রে ক্রমাগত ভুল ?"

"হ্যাঁ, তাই ত হয়েচে দেখ্‌চি—তা' কথাটা আমার তত মনে ছিল না।"

পরদিন প্রমীলা পড়িতে আসিল না, সুরেন্দ্ররও তত মনে হইল না। তাহার পর-দিনও আসিল না—সে দিনও অমনি গেল!

তৃতীয় দিবস প্রমীলাকে না দেখিতে পাইয়া, সুরেন্দ্রনাথ এক জন ভৃত্যকে কহিল, "প্রমীলাকে ডেকে আন।"

ভৃত্য ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "ছোটদিদি আর আপনার কাছে পড়্‌বেন না।"

"কার কাছে তবে পড়্‌বে ?"

ভৃত্য বুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল, "অন্য মাষ্টার আস্‌বে।"

বেলা তখন নয়টা বাজিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া দুই তিন খানা বই বগলে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চশমাটা খাপে পুরিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, তাহার পর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ভৃত্য কহিল, "মাষ্টারবাবু, এ সময়ে কোথায় যাচ্চেন ?"

"বড়দিদিকে ব'লে দিও, আমি চ'লে যাচ্ছি।"

"আর আস্‌বেন না?"

সুরেন্দ্রনাথ একথা শুনিতে পাইল না! বিনা উত্তরে ফটকের বাহিরে আসিয়া পড়িল। বেলা দুইটা বাজিয়া গেল, তথাপি সুরেন্দ্রনাথ ফিরিল না। ভৃত্য তখন মাধবীকে সংবাদ দিল, মাষ্টার-মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন।

"কোথায় গেছেন?"

"তা জানি না। বেলা নটার সময়ে চলে যান; যাবার সময় আমাকে বলে যান যে, বড়দিদিকে বলো আমি চলে যাচ্ছি।"

"সে কি রে? না খেয়ে চলে গেলেন?" মাধবী উদ্বিগ্ন হইল।

তাহার পর সে নিজে সুরেন্দ্রনাথের কক্ষে আসিয়া দেখিল—সব জিনিষ-পত্রই তেমনি আছে, টেবিলের উপর চশমাটি খাপে মোড়া রাখা আছে, শুধু বই কয়খানি নাই।

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল—সুরেন্দ্র আসিল না। পরদিন মাধবী দুইজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিয়া দিল, "তোমরা অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া আনিলে, দশ টাকা পুরস্কার পাইবে। পুরস্কারের লোভে তাহারা ছুটিল; কিন্তু সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিল, কহিল, "কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।"

প্রমীলা কাঁদিয়া কহিল, "বড়দিদি, তিনি চলে গেলেন কেন?"

মাধবী তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিল, "বাইরে যা, কাঁদিস্‌নে।"

দুই দিন, তিন দিন করিয়া দিন যত যাইতে লাগিল, মাধবী তত অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। বিন্দু কহিল, "বড়দিদি, তা এত খোঁজা-খুঁজি কেন? কল্‌কাতা সহরে আর কি মাষ্টার পাওয়া যায় না।"

মাধবী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুই দূর হ—একটা মানুষ একটি পয়সা হাতে না নিয়ে চলে গেল, আর তুই বলিস্ খোঁজাখুঁজি কেন ?"

"তার কাছে একটিও পয়সা নেই, তা কি ক'রে জান্‌লে ?"

"তা আমি জানি, কিন্তু তোর অত কথায় কাজ কি ?"

বিন্দু চুপ করিয়া গেল। ক্রমে যখন সাত দিন কাটিয়া গেল, অথচ কেহ ফিরিয়া আসিল না, তখন মাধবী একরূপ অন্ন জল ত্যাগ করিল। তাহার মনে হইত, সুরেন্দ্রনাথ অনাহারে আছে।, যে বাড়ীর জিনিষ চাহিয়া খাইতে পারে না, পরের কাছে কি সে চাহিতে পারে ? তাহার দৃঢ় ধারণা, সুরেন্দ্রনাথের কিনিয়া খাইবার পয়সা নাই, ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, ছোট ছেলের মত অসহায় অবস্থায় হয় ত বা কোন ফুটপাথে বসিয়া কাঁদিতেছে, না হয় কোন গাছের তলায় বই মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া আছে।

ব্রজরাজবাবু ফিরিয়া আসিয়া সব কথা শুনিয়া মাধবীকে কহিলেন, "কাজটা ভাল হয়নি মা" মাধবী কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল।

এদিকে সুরেন্দ্রনাথ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। তিন দিন অনাহারে কাটিল ; কলের জলে পয়সা লাগে না, তাই ক্ষুধা পাইলে, পেট ভরিয়া জল খাইত।

একদিন রাত্রে অবসন্ন-শরীরে সে কালীঘাটে যাইতেছিল, কোথায় নাকি শুনিয়াছিল, সেখানে খাইতে পাওয়া যায়। অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার মেঘ করিয়াছিল, চৌরঙ্গীর মোড়ে একখানা গাড়ী তাহার উপর আসিয়া পড়িল। গাড়োয়ান কোনরূপে অশ্বের বেগ সংবরণ করিতে পারিয়াছিল। সুরেন্দ্র প্রাণে মরিল না বটে,

কিন্তু বক্ষে ও পার্শ্বে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল ; পুলিশ আসিয়া গাড়ী করিয়া, হাঁসপাতালে লইয়া গেল। চার পাঁচ দিন অজ্ঞান অবস্থায় অতীত হইবার পর, রাত্রে চক্ষু চাহিয়া কহিল, "বড়দিদি !"

কলেজের একজন ছাত্র, যে সে রাত্রে 'ডিউটিতে' ছিল, শুনিতে পাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরেন্দ্র কহিল, "বড়দিদি এসেছেন ?"

"কাল সকালে আস্‌বেন।"

পরদিন সুরেন্দ্রের বেশ জ্ঞান রহিল, কিন্তু বড়দিদির কথা কহিল না, প্রবল জ্বরে সমস্তদিন ছট্‌ফট্‌ করিয়া সন্ধ্যার সময় একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি হাঁসপাতালে আছি ?"

"হাঁ।"

"কেন ?"

"আপনি গাড়ী-চাপা পড়েছিলেন।"

"বাঁচ্‌বার আশা আছে ?"

"নিশ্চয়।"

পরদিন সেই ছাত্রটি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার আত্মীয় কেহ এখানে আছেন ?"

"কেহ না।"

"তবে সে রাত্রে বড়দিদি বলে ডাক্‌ছিলেন কাকে ? তিনি কি এখানে আছেন ?"

"আছেন, কিন্তু তিনি আস্‌তে পার্‌বেন না। আমার পিতাকে সংবাদ দিতে পারেন ?"

"পারি।"

সুরেন্দ্রনাথ পিতার ঠিকানা বলিয়া দিল। সেই ছাত্রটি সেইদিন পত্র লিখিয়া দিল। তাহার পর বড়দিদির সন্ধান লইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে স্ত্রীলোক ইচ্ছা করলে আসতে পারেন, আমরা সে বন্দোবস্ত করতে পারি। আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ঠিকানা জানতে পারলে, তাঁকেও সংবাদ দিতে পারি।—"

সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, ব্রজরাজবাবুর ঠিকানা কহিয়া দিল।

"আমার বাসা ব্রজবাবুর বাড়ীর নিকটেই, আজ তাঁকে আপনার অবস্থা জানাব। যদি ইচ্ছা করেন, তিনি দেখতে আসতে পারেন।"

সুরেন্দ্র কথা কহিল না। মনে মনে বুঝিয়াছিল—বড়দিদির আসা অসম্ভব। ছাত্রটি কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া ব্রজবাবুকে সংবাদ দিল। ব্রজবাবু চমকিত হইলেন, "বাঁচবে ত?"

"সম্পূর্ণ আশা আছে।"

বাড়ীর ভিতর গিয়া কন্যাকে কহিলেন, "মাধবী, যা ভাবছিলাম তাই হয়েছে! সুরেন গাড়ীচাপা প'ড়ে হাঁসপাতালে আছে।"

মাধবীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। "তোমার নাম ক'রে নাকি বড়দিদি বলে ডাকছিল। তুমি দেখতে যাবে?" এই সময় পার্শ্বের কক্ষে প্রমীলা, ঝন্ ঝন্ করিয়া কি সব ফেলিয়া দিল। মাধবী সেই দিকে ছুটিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তুমি দেখে এসো, আমি যেতে পারব না।"

ব্রজবাবু দুঃখিতভাবে, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সে বনের পশু—তার উপরে কি রাগ করে?"

মাধবী কথা কহিল না। তবে ব্রজবাবু একাকী সুরেন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল, কহিলেন, "সুরেন, তোমার পিতামাতাকে সংবাদ দিলে হয় না?"

"সংবাদ দিয়েছি।"

"কোন ভয় নেই, তাঁরা আস্‌লেই একটা বন্দোবস্ত ক'রে দেব।"

ব্রজবাবু টাকা কড়ির জন্য চিন্তা করিয়া কহিলেন, "বরং আমাকে তাঁদের ঠিকানা বলে দাও, যাতে তাঁদের এখানে আসার পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তা করে দেব।"

সুরেন্দ্র কথাটা তেমন বুঝিল না। বলিল, "বাবা আস্‌বেন, অসুবিধা আর কি আছে?"

ব্রজবাবু বাটী ফিরিয়া মাধবীকে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন। সেই অবধি নিত্য তিনি একবার করিয়া সুরেন্দ্রকে দেখিতে যাইতেন। তাহার উপর একটা স্নেহ জন্মিয়াছিল। একদিন ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মাধবী, তুমি ঠিক বুঝেছিলে, সুরেনের পিতা বেশ অর্থবান্‌ লোক।"

মাধবী আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ক'রে জান্‌লে?"

"তার পিতা একজন বড় উকিল; কাল রাত্রে তিনি এসেছেন।"

মাধবী মৌন হইয়া রহিল। তাহার পিতা কহিলেন, "সুরেন বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিল।"

"কেন?"

ব্রজরাজবাবু কহিলেন, "তাহার পিতার সহিত আজ আলাপ হইল; তিনি সে কথা সমস্ত বলিলেন। এই বৎসর পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ সম্মানের সহিত সুরেন এম্, এ, পাশ করিলে,

বিলাত যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নিতান্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক বলিয়া তাহার পিতা সাহস করিয়া পাঠাইতে চাহেন নাই; তাই রাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। সে ভাল হইলে, তিনি বাটী লইয়া যাইবেন।

নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, উচ্ছ্বসিত অশ্রু সংবরণ করিয়া লইয়া মাধবী বলিল, "তাই ভাল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছয়মাস হইল সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মাধবী একটিবার মাত্র মনোরমাকে পত্র লিখিয়াছিল, আর লেখে নাই।

পূজার সময় মনোরমা পিতৃভবনে আসিয়া মাধবীকে ধরিয়া বসিল, "তোর বাঁদর দেখা।"

মাধবী হাসিয়া কহিল, "বাঁদর কোথায় পাব লো?"

মনোরমা তাহার চিবুকে হাত দিয়া সুর করিয়া মৃদুকণ্ঠে গাহিল,—

"আমি এলাম ছুটে দেখ্‌ব বলে,
কেমন শোভে পোড়ার বাঁদর—
তোর ঐ রাঙা চরণতলে।"

"সেই যে পুষেছিলি?"

"কবে?"

মনোরমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "মনে নেই? যে তোকে বই আর জানত না?"

মাধবী কথাটা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছিল, তাই অল্পে অল্পে মুখখানি বিবর্ণ হইতেছিল ; তথাপি আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "ওঃ—তাঁর কথা ? তিনি আপনি চলে গেছেন।"

"অমন রাঙা পা-দুটি তার পছন্দ হ'ল না ?"

মাধবী মুখ ফিরাইল—কথা কহিল না। মনোরমা হাত দিয়া আদর করিয়া তাহার মুখ ফিরাইল—কৌতুক করিতে গিয়া দেখিল, তাহার দুই, চক্ষে একরাশি জল আনিয়া দিয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "একি মাধবী !"

মাধবী আর সামলাইতে পারিল না—চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মনোরমার বিস্ময়ের সীমা নাই—একটা উপযুক্ত কথাও সে খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ কাঁদিতে দিল! তাহার পর জোর করিয়া মুখ হইতে অঞ্চল খুলিয়া লইয়া নিতান্ত দুঃখিতভাবে বলিল, "একটা সামান্য কৌতুক সইতে পার্‌লে না বোন্ !"

মাধবী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "আমি যে বিধবা দিদি !" তাহার পর দুই জনেই চুপ করিয়া রহিল। দুই জনেই নীরবে কাঁদিতে লাগিল। মনোরমা কাঁদিতেছিল—মাধবীর দুঃখে। সে বিধবা তাই বলিয়া—কিন্তু মাধবীর অন্য কারণ ছিল। এখনি না জানিয়া মনোরমা যে ঠাট্টা করিয়াছে, "সে তোকে বই আর জান্‌ত না"—মাধবী তাহাই ভাবিতেছিল। একথা যে নিতান্ত সত্য, সে তাহা জানিত। অনেকক্ষণ পরে মনোরমা বলিল, "কাজটা কিন্তু ভাল হয়নি !"

"কোন্ কাজটা ?"

"তা' কি ব'লে দিতে হবে বোন্?—আমি সব বুঝেছি!"

এই ছয়মাস ধরিয়া যে কথা মাধবী প্রাণপণে লুকাইয়া আসিতেছিল, মনোরমার কাছে আর তাহা লুকাইতে পারিল না। ধরা পড়িয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, বড় ছেলে-মানুষের মত কাঁদিল।

শেষকালে মনোরমা বলিল, "কিন্তু গেল কেন?

"আমি যেতে ব'লেছিলাম।"

"বেশ ক'রেছিলে—বুদ্ধিমতীর কাজ ক'রেছিলে।"

মাধবী বুঝিল, মনোরমা কিছুই বোঝে নাই—তাই একে একে সব কথা বুঝাইয়া কহিল। তাহার পর বলিল, "কিন্তু তিনি যদি না বাঁচ্‌তেন, তা' হলে বোধ হয় পাগল হ'য়ে যেতাম।" মনোরমা মনে মনে কহিল,—"এখনই বা তার কম কি?"

সেদিন বড় দুঃখিত হইয়া সে বাড়ী চলিয়া গেল। সেই রাত্রেই—কাগজ কলম লইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল—

"তুমি ঠিক বলিতে—স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নাই! আমিও আজ তাহাই বলিতেছি, কেন না মাধবী আমাকে শিখাইয়াছে। আমি তাহাকে বাল্যকাল হইতে জানি, তাই তাহাকে দোষ দিতে ইচ্ছা হয় না, সাহস হয় না; সমস্ত স্ত্রীজাতিকে দোষ দিই—বিধাতাকে দোষ দিই—তিনি কিজন্য এত কোমল, এই জলের মত তরল পদার্থ দিয়া নারীর হৃদয় গড়িয়াছিলেন? এত ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া এ হৃদয় কে গড়িতে সাধিয়াছিল? তাঁহার চরণে প্রার্থনা, যেন এ হৃদয়গুলা একটু শক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়;—আর তোমার চরণে প্রার্থনা, যেন ঐ পায়ে মাথা রাখিয়া ঐ মুখপানে চাহিয়া মরিতে

পারি! মাধবীকে দেখিয়া বড় ভয় হয়,—সে আমার আজন্মের ধারণা ওলট্‌পালট্ করিয়া দিয়াছে। আমাকেও বেশী বিশ্বাস করিও না—শীঘ্র আসিয়া লইয়া যাইও—”

তাহার স্বামী উত্তরে লিখিলেন—

“যাহার রূপ আছে, সে দেখাইবেই। যাহার গুণ আছে, সে প্রকাশ করিবেই। যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, যে ভালবাসিতে জানে—সে ভাল বাসিবেই। মাধবীলতা রসাল বৃক্ষ অবলম্বন করে, ইহা জগতের রীতি—তুমি আমি কি করিতে পারি? তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করি—সেজন্য চিন্তিত হইও না।”

মনোরমা স্বামীর পত্র মাথায় রাখিয়া মনে মনে তাঁহার চরণ-উদ্দেশে প্রণাম করিয়া লিখিল—“মাধবী পোড়ামুখী—বিধবাকে যাহা করিতে নাই, সে তাই করিয়াছে। মনে মনে আর একজনকে ভালবাসিয়াছে।”

পত্র পাইয়া মনোরমার স্বামী মনে মনে হাসিলেন তাহার পর কৌতুক করিয়া লিখিলেন, “মাধবী পোড়ামুখী তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেন না বিধবা হইয়া মনে মনে আর একজনকে ভাল-বাসিয়াছে। তোমাদের রাগ হইবার কথা—বিধবা হইয়া কেন সে তোমাদের সধবার অধিকারে হাত দিতে গিয়াছে! আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমার কোন চিন্তা নাই—এমন সুবিধা কিছুতেই ছাড়িও না! এই অবসরটুকুর মধ্যে পরম আরামে আর একজনকে মনে মনে ভালবাসিয়া লইও। কিন্তু কি জানো মনোরমা, তুমি আমাকে আশ্চর্য্য করিতে পার নাই, আমি একবার একটা লতা দেখিয়াছিলাম, সেটা আধ ক্রোশ ধরিয়া ভূমিতলে লতাইয়া লতাইয়া

অবশেষে একটা বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহাতে কত পাতা, কত পুষ্পমঞ্জরী! তুমি যখন এখানে আসিবে, তখন দুজনে সেটিকে দেখিয়া আসিব!"

মনোরমা রাগ করিয়া তাহার উত্তর দিল না।

কিন্তু মাধবীর চোখের কোণে কালী পড়িয়াছে, প্রফুল্ল মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়াছে, কাজকর্ম্মে তেমন বাঁধনি নাই—একটু ঢিলারকমের হইয়াছে। সকলকে যত্ন আত্মীয়তা করিবার ইচ্ছা তেমনি আছে, বরং বাড়িয়াছে—কিন্তু সব কাজগুলা আর তেমন মনে থাকে না—মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যায়।

এখনো সবাই কহে বড়দিদি, এখনো সবাই সেই কল্পতরুটির পানে চাহিয়া থাকে, হাত পাতে, অভীষ্ট ফল পায়; কিন্তু গাছ আর তেমন সরস সতেজ নাই। পুরাতন লোকগুলির মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়—পাছে শুকাইয়া যায়।

মনোরমা নিত্য আসে, অন্যান্য কথা হয়—শুধু একথা আর হয় না। মাধবী দুঃখিত হয়, মনোরমা তাহা বুঝিতে পারে। আর এসকল কথার আলোচনা যত না হয়, ততই ভাল। হতভাগী যদি ভুলিতে পারে, মনোরমা এ কথাও ভাবে।

সুরেন্দ্রনাথ আরাম হইয়া পিতার সহিত বাটী চলিয়া গিয়াছে। বিমাতা তাঁহার যত্নটা একটু কম করিতে আরম্ভ করিলেন, তাই সুরেন্দ্র শরীরে একটু আরাম পাইয়াছে, কিন্তু শরীর বেশ সারিতে পায় নাই—অন্তরে একটু ব্যথা আছে। রূপ যৌবনের আকাঙ্ক্ষা পিপাসা এখনো তাহার মনে উদয় হয় নাই,—এ সব সে জানিত না। পূর্ব্বের মত এখনো সে অন্যমনস্ক, আত্মনির্ভর-শূন্য। কিন্তু

কাহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, এটাই সে খুঁজিয়া পায় না। খুঁজিয়া পায় না বলিয়াই সেই যে নিজের কাজ নিজে দেখিতে পারে, তাহাও নহে, আজও পরের পানে চাহিয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্বের মত তেমন আর মনে ধরে না, সব কাজেই যেন একটু ত্রুটি দেখিতে পায়, একটু খুঁত খুঁত করে। তাহার বিমাতা দেখিয়া শুনিয়া কহেন, "সুরো আজকাল বদ্‌লে গেছে।"

মধ্যে একদিন তাহার জ্বর হইয়াছিল। বড় কষ্ট হইয়াছিল; চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল; বিমাতা কাছে বসিয়াছিলেন—তিনি একটা নূতন জিনিষ দেখিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহারও চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল; আদর করিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া কহিলেন, "সুরো কেন বাবা?" সুরেন চুপ করিয়া রহিল। তারপর, একখানা পোষ্টকার্ড চাহিয়া লইয়া আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখিয়া দিল—বড়দিদি আমার জ্বর হইয়াছে, বড় কষ্ট হইতেছে।

পত্রখানা ডাকঘরে পৌঁছিল না। প্রথমে শয্যা হইতে মেজের উপরে পড়িল, তাহার পর যে ঘর ঝাঁটাইতে আসিল, সে বেদানার খোসা, বিস্কুটের টুক্‌রা, আঙ্গুরের তূলা এবং সেই চিঠিখানি, সব একসঙ্গে ঝাঁটাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল, সুরেন্দ্রনাথের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ধূলা মাখিয়া, হাওয়ায় উড়িয়া, শিশিরে ভিজিয়া, রোদ খাইয়া, অবশেষে একটা বাব্‌লা-গাছের তলায় পড়িয়া রহিল।

প্রথমে সে একখানি মূর্ত্তিমতী উত্তরের আশায় চাহিয়া রহিল, তাহার পর একখানি হস্তাক্ষর—কিন্তু, অনেক দিন কাটিয়া গেল, কিছুই আসিল না। ক্রমে তাহার জ্বর সারিয়া গেল—পথ্য করিয়া উঠিয়া বসিল।

তাহার পর, তাহার জীবনে এক নূতন ঘটনা ঘটিল। ঘটনা যদিও নূতন, কিন্তু নিতান্ত স্বাভাবিক। সুরেন্দ্রের পিতা রায় মহাশয় ইহা বহুদিন হইতে জানিতেন এবং আশা করিতেন। সুরেনের মাতামহ পাবনা-জেলায় একজন মধ্যবিত্ত জমিদার। কুড়ি পঁচিশ খানি গ্রামে জমিদারী; বাৎসরিক আয় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে। একে তিনি অপুত্রক, খরচ-পত্র স্বভাবতঃ কম, তাহাতে তিনি একজন প্রসিদ্ধ কৃপণ ছিলেন। তাই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের বহু অর্থ সঞ্চিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে সমস্ত বৈভব একমাত্র দৌহিত্র সুরেন্দ্রনাথ পাইবে, রায়-মহাশয় ইহা স্থির জানিতেন। তাহাই হইল। রায়মহাশয় সংবাদ পাইলেন, শ্বশুর মহাশয় আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছেন! তাড়াতাড়ি পুত্রকে লইয়া পাবনা যাত্রা করিলেন। কিন্তু পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, শ্বশুর মহাশয় পরলোক গমন করিলেন।

সমারোহ করিয়া শ্রাদ্ধ-শান্তি হইল। শৃঙ্খলিত জমিদারিতে আরো শৃঙ্খলার ঘটা পড়িয়া গেল। পরিপক্ব-বুদ্ধি প্রাচীন উকীল রায়-মহাশয়ের কড়া বন্দোবস্তে, প্রজারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এখন সুরেন্দ্রর বিবাহ হওয়া আবশ্যক। ঘটেকের আনাগোনায় গ্রামময় আন্দোলন পড়িয়া গেল। পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে যে বাড়ীতে একটী সুন্দরী কন্যা ছিল, সেই বাড়ীতেই ঘটকের দল, ঘন ঘন পদধূলি দিয়া, পিতা-মাতাকে আপ্যায়িত ও আশান্বিত করিতে লাগিল,—এমনভাবে দুই মাস ছয় মাস অতিবাহিত হইল।

অবশেষে বিমাতা আসিলেন; তাঁহার সম্পর্কের যে কেহ ছিল, সে-ও আসিল—বন্ধুবান্ধবে গৃহ পুরিয়া গেল।

তাহার পর, একদিন প্রভাতে, বাঁশী বাজাইয়া, ঢাকের প্রচণ্ড শব্দ করিয়া, কাঁশীর খন্ খন্ আওয়াজে সমস্ত গ্রাম পরিপূরিত করিয়া, সুরেন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়া আসিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। রায়-মহাশয়ও আর নাই, ব্রজলাল লাহিড়ীও স্বর্গে গিয়াছেন। সুরেন্দ্রের বিমাতা স্বর্গীয় স্বামিদত্ত সমস্ত সম্পত্তি, টাকাকড়ি লইয়া পিতৃ-ভবনে বাস করিতেছেন।

আজকাল সুরেন্দ্রনাথের যেমন সুখ্যাতি, তেমনি অখ্যাতি একদল লোক কহে; এমন বন্ধুবৎসল; উদারচেতা, অমায়িক, ইয়ার-প্রতিপালক জমিদার আর নাই। অন্য দল কহে, এমন উৎপীড়ক, অত্যাচারী জমিদার এ তল্লাটে কখন জন্মায় নাই।

আমরা জানি, এ দুইটা কথাই সত্য। প্রথমটি সুরেন্দ্রনাথের জন্য সত্য, দ্বিতীয়টী তাঁহার ম্যানেজার মথুরনাথ বাবুর জন্য সত্য।

সুরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় আজকাল খুব একদল ইয়ার বসিতেছে; তাহারা পরম সুখে সংসারের সাধ মিটাইয়া লইতেছে। পান-তামাক, মদ-মাংস—কোন ভাবনা তাহাদিগকে করিতে হয় না। চাহিতেও হয় না—আপনি মুখে আসে।

ম্যানেজার মথুরবাবুর ইহাতে খুব উৎসাহ। খরচ যোগাইতে তিনি মুক্ত-হস্ত। কিন্তু এজন্য জমিদারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়

না ; তাঁহার শসান-গুণে প্রজারা সে ব্যয় বহন করে। মথুরবাবুর নিকট একটি পয়সা বাকি-বকেয়া থাকিবার যো নাই। ঘর জ্বালাইতে, ভিটা-ছাড়া করিতে, কাছারি-ঘরের ক্ষুদ্র কুঠুরিতে আবদ্ধ করিতে, তাঁহার সাহস এবং উৎসাহের সীমা নাই।

প্রজার আকুল ক্রন্দন মাঝে মাঝে শান্তি-দেবীর কর্ণে প্রবেশ করে। সে স্বামীকে অনুযোগ করিয়া কহে, "তুমি নিজের জমিদারি না দেখ্‌লে সব যে জ্বলে পুড়ে যায়।"

সুরেন্দ্রনাথের যেন চমক ভাঙ্গে, "তাই ত, তাই ত, এ সব কথা কি সত্য ?"

"সত্য নয়! নিন্দায় যে দেশ ভরে গেল—তোমারই কাণে কেবল এ সব পৌঁছায় না। চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ার নিয়ে বসে থাক্‌লে কি এ সব কথা কেউ শুন্‌তে পায় ? কাজ নেই অমন ম্যানেজারে, দূর ক'রে তাড়িয়ে দাও।"

সুরেন্দ্র দুঃখিত হইয়া অপ্রতিভ হইয়া কহে, "তাই ত, কাল থেকে আমি নিজে সব দেখ্‌ব।" তাহার পর কিছুদিন জমিদারি দেখিবার তাড়া পড়িয়া যায়। মথুরানাথ ব্যস্ত হইয়া উঠেন, গম্ভীর-ভাবে কথন কহেন, "সুরেনবাবু, এমন কর্‌লে কি জমিদারি রাখ্‌তে পার্‌বে ?"

সুরেন্দ্রনাথ শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহে, "দুঃখীর রক্ত শুষে এমন জমিদারিতে কাজ কি, মথুরবাবু।"

"তবে আমাকে বিদায় দাও—আমি চলে যাই।"

সুরেন্দ্র অমনি নরম হইয়া যায়। তাহার পর যাহা ছিল, তাহাই হয়। সুরেন্দ্রনাথ বৈঠকখানা হইতে আর বাহির হয় না।

সম্প্রতি আবার একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। বাগানবাটী প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে নাকি এলোকেশী বলিয়া কে একটা মানুষ কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। নাচিতে-গাহিতে খুব মজবুত, দেখিতে শুনিতেও মন্দ নয়। ভগ্ন মধুচক্র মৌমাছির মত বৈঠকখানা ছাড়িয়া ঝাঁক বাঁধিয়া ইয়ারের দল সেই দিকে ঝুঁকিয়াছে। তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহ রাখিবার স্থান নাই; সুরেন্দ্রনাথকেও তাহারা সেইদিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। আজ তিন দিন হইল, শান্তির স্বামিদর্শন ঘটে নাই। চার দিনের দিন সে স্বামীকে পাইয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বসিল, "এতদিন ছিলে কোথায়?" "বাগান-বাড়ীতে।" "সেখানে কে আছে যে, তিন দিন ধরে পড়েছিলে?" "তাই ত—"

"সব কথায় তাই ত! আমি সমস্ত শুনেছি।" বলিতে বলিতে শান্তি কাঁদিয়া ফেলিল, "আমি কি দোষ করেচি যে, আমাকে পায়ে ঠেল্ছ? "কৈ তা ত আমি—"

"আবার কি করে পায়ে ঠেল্তে হয়? এর চেয়ে অপমান আমাদের আর কি আছে?" "তাই ত—তা—ওরা সব—"

শান্তি যেন সে কথা শুনিতে পাইল না। আরো কাঁদিয়া কহিল, "তুমি স্বামী, আমার দেবতা! আমার ইহকাল! আমার পরকাল! আমি কি তোমাকে চিনিনে! আমি জানি, আমি তোমার কেউ নই, একদিনের জন্যও তোমার মন পাই না। এ যাতনা তোমাকে বল্‌ব কি! পাছে তুমি লজ্জা পাও, পাছে তোমার ক্লেশ হয়, তাই কোন কথা বলি না।"

"শান্তি, কেন কাঁদ?"

"কেন কাঁদি? অন্তর্যামী জানেন। তাও বুঝিতে পারি যে তুমি অযত্ন কর না—তোমারও মনে ক্লেশ আছে—তুমি আর কি করবে?" তাহার পর চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আমি আজীবন যাতনা পাই, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার কি কষ্ট যদি জান্‌তে পারি—"

সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া, স্বহস্তে তাহার চক্ষু মুছিয়া দিয়া সস্নেহে কহিল, "তা' হ'লে কি কর, শান্তি?"

এ কথার কি আর উত্তর আছে? শান্তি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল!

বহুক্ষণ পরে শান্তি কহিল, "তোমার শরীরও আজ কাল ভাল নেই।"

"আজ কেন, পাঁচ বছর থেকে নেই। যে দিন কলিকাতায় গাড়ী-চাপা পড়েছিলাম, বুকে পিঠে আঘাত পেয়ে একমাস শয্যায় পড়েছিলাম, সেই অবধি শরীর ভাল নেই। সে ব্যথা কিছুতেই গেল না, মাঝে মাঝে নিজেই আশ্চর্য্য হই, কেমন করে বেঁচে আছি।"

শান্তি তাড়াতাড়ি স্বামীর বুকে হাত দিয়া বলিল, "চল, দেশ ছেড়ে আমরা কলিকাতায় যাই, সেখানে ভাল ডাক্তার আছে—"

সুরেন্দ্র সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, "তাই চল! সেখানে বড়-দিদিও আছেন।"

শান্তি বলিল, "তোমার বড়দিদিকে আমারও বড় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, তাঁকে আন্‌বে ত?"

"আন্‌ব বই কি!" তাহার পর ঈষৎ ভাবিয়া বলিল, "নিশ্চয় আস্‌বেন, আমি ম'রে যাচ্ছি শুন্‌লে—"

শান্তি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, "তোমার পায়ে পড়ি, আর ও সব বলো না।" "আহা তিনি যদি আসেন ত আমার কোন দুঃখই থাকে না!"

অভিমানে শান্তির বুক পূরিয়া গেল। এইমাত্র সে বলিয়াছিল, স্বামীর সে কেহ নহে। সুরেন্দ্র কিন্তু অত বুঝিল না। অত দেখিল না, যাহা বলিতেছিল, তাহাতে বড় আনন্দ হয়, কহিল, "তুমি নিজে গিয়ে বড়দিদিকে ডেকে এনো, কেমন?" শান্তি মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল।

"তিনি এলে দেখ্‌তে পাবে, আমার কোন কষ্ট থাক্‌বে না।" শান্তির চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

পরদিন সে দাসীকে দিয়া মথুরবাবুকে সংবাদ প্রেরণ করিল যে, বাগানবাটীতে যাহাকে আনা হইয়াছে, এখনি তাহাকে তাড়াইয়া না দিলে, তাহাকে আর ম্যানেজারের কাজ করিতে হইবে না! স্বামীকে শাসাইয়া বলিল, "আর যাই হোক্, তুমি বাড়ীর বাহির হইলে আমি মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হয়ে মরব।"

"তাই ত,—ওঁরা কিন্তু—"

"আমি 'কিন্তুর' ব্যবস্থা কর্‌চি।" বলিয়া শান্তি দাসীকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া হুকুম করিয়া দিল,—"দরোয়ানকে ব'লে দে, যেন ঐ হতভাগারা আমার বাড়ীতে না ঢুকৃতে পায়!"

আর সুবিধা নাই দেখিয়া মথুরবাবু এলোকেশীকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইয়ার-দলও ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি চুটাইয়া জমিদারী দেখিতে মন দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথেরও সম্প্রতি কলিকাতায় যাওয়া হইল না, বুকের

ব্যথাটা আপাততঃ কিছু কম বোধ হইতেছে। শান্তিরও কলিকাতা যাইতে তেমন উৎসাহ নাই। এখানে থাকিয়া যতখানি সম্ভব, সে স্বামিসেবার আয়োজন করিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে এক-জন বিজ্ঞ ডাক্তার আনাইয়া দেখাইল। বিজ্ঞ চিকিৎসক সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, বক্ষের অবস্থা যেমন আছে, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক কোনরূপ পরিশ্রমই সঙ্গত নহে।

অবসর বুঝিয়া ম্যানেজারবাবু যেরূপ কাজ দেখিতেছিলেন, তাহাতে গ্রামে গ্রামে দ্বিগুণ হাহাকার উঠিল। শান্তি মাঝে মাঝে শুনিতে পাইত, কিন্তু স্বামীকে জানাইতে সাহস করিত না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার বাটীতে ব্রজবাবুর স্থানে শিবচন্দ্র এখন কর্ত্তা। মাধবীর পরিবর্ত্তে নূতন-বধূ এখন গৃহিণী। মাধবী এখনও এখানে আছে। ভাই শিবচন্দ্র স্নেহ-যত্ন করে, কিন্তু মাধবীর এখানে থাকিতে আর মন নাই। বাড়ীর দাস-দাসী, সরকার-গোমস্তা এখনো "বড়দিদি" বলে, কিন্তু সবাই বুঝে যে, আর একজনের হাতে এখন সিন্দুকের চাবি পড়িয়াছে। তাই বলিয়া শিবচন্দ্রের স্ত্রী যে মাধবীকে অবজ্ঞা বা অমর্য্যাদা করে, তাহা নহে, কিন্তু সে এমন ভাবটি দেখাইয়া যায়, যাহাতে বেশ বুঝিতে পারে যে, এই নূতন স্ত্রীলোকটির অনুমতি পরামর্শ ব্যতীত সব কাজ করা এখন আর তাহার মানায় না।

তখন বাপের আমল ছিল, এখন ভাইয়ের আমল হইয়াছে। কাজেই একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে। আগে আদর ছিল, আবদার ছিল,—এখন আদর আছে, কিন্তু আবদার নাই। বাপের আদরে সে সর্ব্বময়ী ছিল, এখন আত্মীয়-কুটুম্বের দলে পড়িয়াছে।

এখন যদি কেহ বলেন যে, আমি শিবচন্দ্র কিংবা তাহার স্ত্রীর দোষ দিতেছি, সোজা করিয়া না বলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিন্দা করিতেছি, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন। সংসারে যাহা নিয়ম, যে রীতি-নীতি আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, আমি তাহারই উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। মাধবীর যেন কপাল পুড়িয়াছে, তাহার আপনার বলিবার স্থান নাই, তাই বলিয়া অপরে নিজের দখল ছাড়িবে কেন? স্বামীর দ্রব্যে স্ত্রীর অধিকার, এ কথা কে না জানে? শিবচন্দ্রের স্ত্রী কি শুধু এ কথা বুঝে না? শিবচন্দ্র না হয় মাধবীর ভ্রাতা, কিন্তু সে মাধবীর কে? পরের জন্য সে নিজের অধিকার ছাড়িয়া দিবে কেন? মাধবী সব বুঝিতে পারে। বউ যখন ছোট ছিল, যখন ব্রজবাবু বাঁচিয়া ছিলেন, তখন মাধবীর নিকট প্রমীলাতে ও তাহাতে প্রভেদ ছিল না। এখন কথার অনৈক্য হয়। সে চিরদিন অভিমানিনী, তাই সে সকলের নীচে! কথা কহিবার ক্ষমতা নাই, তাই সে কথা কহে না। যেখানে তাহার জোর নাই, সেখানে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যায়! মনে দুঃখ পাইলে নীরবে সহিয়া যায়,—শিবচন্দ্রকে কিছুই বলে না। স্নেহের দোহাই দেওয়া তাহার অভ্যাসের বাহিরে, তাই আত্মীয়তার ধুয়া ধরিয়া অধিকার কায়েম করিতে, তাহার সমস্ত শরীরে মনে ধিক্কার

উঠে। সামান্য স্ত্রীলোকের মত ঝগড়া-কলহে তাহার যে কত ঘৃণা তাহা শুধু সে-ই জানে!

একদিন সে শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল, "দাদা, আমি শ্বশুর-বাড়ী যাব।" শিবচন্দ্র বিস্মিত হইল। সে কি মাধবি, সেখানে ত কেউ নেই!" মাধবী মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ছোট-ভাগ্নে কাশীতে ঠাকুরঝির কাছে আছে, তাকে নিয়ে আমি গোলাগাঁয় বেশ থাকব।"

পাবনা জেলার গোলাগাঁয়ে মাধবীর শ্বশুর-বাড়ী। শিবচন্দ্র অল্প হাসিয়া বলিল, "তা কি হয়, সেখানে যে তোর বড় কষ্ট হবে!" "কেন কষ্ট হবে, দাদা? বাড়ীটা এখনো প'ড়ে যায় নি। দু বিঘা, দশ বিঘা জমি-জিরাতও আছে, একটি বিধবার কি তাতে চলে না?" "চলার কথা নয়। টাকার ভাবনা নেই, কিন্তু তোর যে বড় কষ্ট হবে, মাধবি!" "কষ্ট কিছুই নয়।" শিবচন্দ্র কিছু ভাবিয়া বলিল, "কেন যাবি, বোন্? আমাকে সব খুলে বল্ দেখি, আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।" ইতিপূর্ব্বে শিবচন্দ্র, বোধ হয়, স্ত্রীর নিকট ভগিনীর বিরুদ্ধে কিছু শুনিয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ তাহাই মনে হইয়াছিল! লজ্জায় মাধবীর সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে বলিল, "দাদা, তুমি কি মনে কর, আমি ঝগড়া ক'রে তোমার বাড়ী থেকে যাব?" শিবচন্দ্র নিজেও লজ্জিত হইল। তাড়াতাড়ি কহিল, "না, না, তা নয়। আমি ও-কথা বলিনে,—কিন্তু এ বাড়ী চিরদিনই তোমার, আজ কেন তবে চ'লে যেতে চাও?" যুগপৎ দুই জনেরই সেই স্নেহময় পিতার কথা মনে পড়িল। দুই জনের চক্ষেই জল দেখা দিল। চোখ মুছিয়া

মাধবী বলিল, "আবার আস্‌ব। তোমার ছেলের যখন পৈতা হবে, তখন নিয়ে এস। এখন যাই!"

"সে-ত আট দশ বছরের কথা।"

"যদি বেঁচে থাকি, তা হ'লে আস্‌ব।"

কোনরূপেই মাধবী এখানে থাকিতে সম্মত হইল না, যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। নূতন-বৌকে সংসার বুঝাইয়া দিল, দাস-দাসীকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। শেষ দিনটিতে শিবচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ-চক্ষে ভগিনীর কাছে আসিয়া বলিল, "মাধবি, তোর দাদা কখনো ত তোকে কিছু বলেনি?"

মাধবী হাসিল, "সে কি কথা, দাদা?"

"তা নয়; যদি কোন অশুভক্ষণে, যদি কোন দিন মুখ থেকে অসাবধানে কিছু—"

"না দাদা, সে সব কিছু নয়।" "সত্যি কথা?" "সত্যি!"

"তবে যা। তোর নিজের বাড়ী যেতে আর মানা কর্‌ব না। যেখানে ভাল লাগে, সেখানে থাক্‌। তবে সর্ব্বদা সংবাদ দিতে ভুলিস্‌নি!"

প্রথমে মাধবী কাশী গিয়া ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইল, তাহার পর তাহার হাত ধরিয়া গোলাগাঁয় আসিয়া, এই দীর্ঘ সাত বৎসর পরে স্বামি-ভবনে প্রবেশ করিল!

তখন গোলাগাঁয়ে চাটুয্যে মহাশয়ের বড় বিপদ্‌ ঘটিল। তিনি এবং যোগেন্দ্রের পিতা উভয়ে বড় বন্ধু ছিলেন। তাই মৃত্যুকালে যোগেন্দ্র, যে কয় বিঘা জমি-জায়দাদ ছিল, তাঁহারই হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের জীবিতকালে, তিনি সে সকলের

তত্ত্বাবধান করিতেন, যোগেন্দ্র সে সকলের বিশেষ কোন সংবাদও লইত না। শ্বশুরমহাশয়ের অনেক টাকা, তাই এই ক্ষুদ্র পিতৃ-দত্ত বিষয়টুকু তাহার যত্নের বাহিরে ছিল। তাহার পর সে মরিবার পর, চাটুয্যে মহাশয় অতিশয় ন্যায্য অধিকারে বিনা বাধায় সে সকল ভোগদখল করিতেছিলেন। এখন বিধবা মাধবী এতদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সুশৃঙ্খল নিয়মবদ্ধ পাতা-সংসারে গোলমাল বাধাইয়া দিল। সুতরাং চাটুয্যে মহাশয়ের ইহা অত্যন্ত অবিচার বলিয়া মনে হইল, এবং মাধবী যে হিংসা করিয়াই এমনটি করিয়াছে, তাহাও তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, তাই ত বউ-মা, তোমার দু-বিঘা যে জমি আছে, তার দশ বৎসরের খাজনা মায় সুদশুদ্ধ একশত টাকা বাকি আছে, সেটা না দিলে জমি নীলাম হবার মত হয়েচে।" মাধবী ভাগিনেয় সন্তোষকুমারকে দিয়া বলাইল যে, টাকার জন্য চিন্তা নাই, এবং অবিলম্বে একশত টাকা বাহিরে পাঠাইয়া দিল। অবশ্য, এ টাকা চাটুয্যে মহাশয়ের অন্য কাজে লাগিল।

মাধবী কিন্তু অত সহজে ছাড়িবার লোক নহে, সে সন্তোষকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, শুধু দুই বিঘা জমির উপর নির্ভর করিয়া তাহার স্বর্গীয় শ্বশুরমহাশয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত না, সুতরাং বাকি যে সব জমি-জায়গা আছে, তাহা কোথায় এবং কাহার নিকটে আছে?

চাটুয্যে মহাশয় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং আসিয়া বলিলেন যে, তাহা সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কিছু বা বন্দোবস্তে আছে।

এই আট দশ বছর ধরিয়া জমিদারের খাজনা না দিলে জমি-জায়গা কিরূপে থাকা সম্ভব ?

মাধবী কহিল, "জমির কিছু কি উপস্বত্ব হইত না যে, এই কয়টা টাকা খাজনা দেওয়া হয় নাই ? আর যদি যথার্থই বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কে বিক্রয় করিয়াছে, এবং এখন কাহার নিকট আছে, সংবাদ পাইলে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা যায়। কাগজ পত্রই বা কোথায় ?" চাটুয্যে মহাশয় অবশ্য কিছু জবাব-দিয়াছিলেন, কিন্তু মাধবী তাহা বুঝিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ বিড়-বিড় করিয়া কত কি বকিলেন, তাহার পর ছাতা মাথায় দিয়া, নামাবলি কোমরে জড়াইয়া, একখানা থান-কাপড় গামছায় বাঁধিয়া লইয়া, জমিদার-বাবুর কাছারি লালতা-গাঁ অভিমুখে রওনা হইলেন। এই লালতা গ্রামে সুরেন্দ্রনাথের বাটী এবং ম্যানেজার মথুরবাবুর কাছারি। ব্রাহ্মণ আট-দশ ক্রোশ বরাবর হাঁটিয়া একেবারে মথুর-বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, "দোহাই বাবা, গরীব ব্রাহ্মণকে বুঝি পথে পথে ভিক্ষা ক'রে খেতে হয়।"

এমন ত অনেক আইসে ! মথুরবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "হয়েছে কি ?" "বাবা, রক্ষে কর।" "কি হয়েছে তোমার ?"

বিধু চাটুয্যে তখন মাধবী-দত্ত একশত টাকা দক্ষিণা হাতে গুঁজিয়া বলিলেন, "আপনি ধর্ম্মাবতার, আপনি না রক্ষা করলে আমার সর্ব্বস্ব যায়।" "আচ্ছা, খুলে বল !"

"গোলাগাঁয়ে রামতনু সান্যালের বিধবা পুত্রবধূ কোথা থেকে এত দিন পরে ফিরে এসে, আমার সমস্ত দখল ক'র্তে চায়।"

মথুরবাবু হাসিলেন, "সে তোমার সমস্ত দখল ক'র্‌তে চায়, না, তুমি তার সর্ব্বস্ব দখল ক'র্‌তে চাও,—কোন্‌টা ?"

ব্রাহ্মণ তখন হাতে পৈতা জড়াইয়া ম্যানেজারের হাত চাপিয়া ধরিলেন, "আমি যে এই দশ বছর থেকে সরকারে খাজনা জুগিয়ে আস্‌চি।"

"জমি ভোগ ক'র্‌চ, খাজনা দেবে না ?"

"দোহাই আপনার—"

ভাবটা মথুরবাবু বেশ বুঝিলেন। "বিধবাকে ফাঁকি দিতে চাও ত ?"

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

"কয় বিঘা জমি ?" "পঁচিশ বিঘা।"

মথুরনাথ হিসাব করিয়া বলিলেন, "অন্ততঃ তিন হাজার টাকা জমিদারি কাছারিতে কত সেলামি দেবে ?"

"যা হুকুম হবে, তাই,—তিনশ টাকা।"

"তিনশ টাকা দিয়ে তিন হাজার টাকা নেবে ? আমার দ্বারা কিছু হবে না।"

ব্রাহ্মণ শুষ্কচক্ষে জল বাহির করিয়া বলিল, "কত টাকা হুকুম হয় ?"

"এক হাজার দিতে পার্‌বে ?"

তাহার পর গোপনে বহুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে পরামর্শ হইল, ফল এই দাঁড়াইল যে, যোগেন্দ্রনাথের বিধবার প্রতি বাকী খাজনা-বাবদ দশ বৎসরের সুদে-আসলে দেড়সহস্র টাকার নালিশ হইল। শমন বাহির হইল, কিন্তু মাধবীর নিকট তাহা পৌঁছিল না। তাহার পর

এক তরফা ডিক্রী হইয়া গেল এবং দেড়মাস পরে মাধবী সংবাদ পাইল যে, বাকী খাজনার দায়ে জমিদার-সরকার হইতে তাহার মায় বাটীশুদ্ধ নীলামের ইস্তাহার জারি হইয়াছে, তাহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে।

মাধবী একজন প্রতিবেশিনীকে ডাকিয়া কহিল, "তোমাদের দেশ কি মগের মুল্লুক ?" "কেন বল দেখি ?"

"তা' নয় ত কি ? একজন ঠকিয়ে আমার সর্ব্বস্ব নিতে চায়, তোমরা দেখচ না ?"

সে বলিল, "আমরা আর কি ক'র্‌ব ? জমিদার যদি নীলাম করে, আমরা দুঃখী লোক তাতে কি ক'র্‌তে পারি ?"

"তা' যেন হ'ল, কিন্তু আমার বাড়ী নিলাম হবে, আর আমাকে সংবাদ নেই ? কেমন তোমাদের জমিদার ?"

সে তখন সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিল,—এমন উৎপীড়ক জমিদার, এমন অত্যাচার, এ দেশে কেহ কখন পূর্ব্বে দেখে নাই। সে আরও কত কি কহিল। এ যাবৎ যাহা কিছু লোক-পরম্পরায় অবগত ছিল, সমস্ত একে একে খুলিয়া বলিল। মাধবী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারবাবুর সঙ্গে নিজে দেখা করলে হয় না ?" ভাগিনেয় সন্তোষকুমারের জন্য মাধবী তাহাও করিতে স্বীকৃত ছিল। সে তখন কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু কথা দিয়া গেল যে, কাল তাহার বোন্‌পোর নিকট সব কথা ভাল করিয়া জানিয়া আসিয়া বলিবে। তাহার বোন্‌পো দুই-তিন বার লালতা-গ্রামে গিয়াছিল; জমিদার সরকারের অনেক কথা সে জানিত। এমন কি, সেদিন সে বাগান-বাড়ীতে এলোকেশীর সংবাদ

পর্য্যন্ত শুনিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর মাসীমাতা যখন জমিদার-বাবুর সহিত রামতনুবাবুর বিধবা পুত্রবধূর দেখা করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল, তখন সে মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিল, "এই বিধবা পুত্র-বধূটির বয়স কত?"

মাসীমাতা বলিল, "তা, কুড়ি একুশ হবে।"

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "দেখ্‌তে কেমন?"

মাসীমাতা কহিল, "পরীর মত।"

তখন সে মুখভঙ্গী-সহকারে কহিল, "দেখা কর্‌লে কাজ হ'তে পারে; কিন্তু আমি বলি, তিনি আজ রাত্রেই নৌকা ভাড়া ক'রে বাপের বাড়ী প্রস্থান করুন।" "কেন রে?"

"এই যে বল্‌চ—সে দেখ্‌তে পরীর মত।"

"কেন, তাতে কি?"

"তাতেই সব। দেখ্‌তে পরীর মত হ'লে জমিদার সুরেন রায়ের কাছে রক্ষে নেই।"

মাসীমাতা গালে হাত দিলেন, "বলিস্ কি, এমন!"

বোন্‌পো মৃদু হাসিয়া কহিল, "হাঁ, এমন। দেশশুদ্ধ লোক এ কথা জানে।" "তবে ত দেখা করা উচিত নয়?" "কিছুতে নয়।"

"কিন্তু বিষয়-আশয় যে সব যাবে!"

"চাটুয্যে মহাশয় যখন এর ভিতর আছেন, তখন বিষয়ের আশা নেই! তার উপর গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে—ধর্ম্মটাও কি যাবে?"

পরদিন তিনি মাধবীকে সমস্ত কথা বলিলেন। শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। জমিদার সুরেন রায়ের কথা সে সমস্ত দিন চিন্তা করিল। মাধবী ভাবিল, সুরেন রায়! নামটি বড় পরিচিত

কিন্তু লোকটির সহিত ত মিলিতেছে না! এ নাম সে কত দিন মনে মনে ভাবিয়াছে। সে আজ পাঁচ বৎসর হইল! ভুলিয়াছিল,—আবার বহুদিন পরে মনে পড়িল।

স্বপ্নে ও নিদ্রায় মাধবীর সে রাত্রি বড় দুঃখে কাটিল। অনেকবার পুরাণো কথাগুলা মনে পড়িতেছিল, অনেকবার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। সন্তোষকুমার তাহার মুখপানে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে কহিল, "পিসীমা, আমি মার কাছে যাব।" মাধবী নিজেও কয়েকবার এ কথা ভাবিয়াছিল—কেন না, এখানকার বাস যখন উঠিয়াছে, তখন কাশীবাস ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সন্তোষের জন্য সে জমিদারের সহিত দেখা করিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় না। পাড়া-প্রতিবাসীরা নিষেধ করিতেছে। তা ছাড়া এখন যেখানেই সে যাক্, একটা নূতন ভাবনা, একটা নূতন উপসর্গ হইয়াছে। সেটা এই রূপ-যৌবনের কথা! মাধবী মনে করিল, পোড়াকপাল! এ উৎপাতগুলা কি এখনো এ দেহটায় লাগিয়া আছে! আজ সাত বৎসর হইল, এগুলা তাহার মনে পড়ে নাই, মনে করিয়া দিতে কেহ ছিল না। স্বামী মরিবার পর যখন বাপের বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন সকলে ডাকিল, "বড়দিদি," সবাই ডাকিল, "মা!" এই সম্মানের ডাকগুলি তাহার মনকে আরও বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। ছাই রূপ-যৌবন! যেখানে তাহাকে বড়দিদির কাজ করিতে হইত, জননীর স্নেহ-যত্ন বিলাইতে হইত, সেখানে কি এ সব কথা মনে থাকে! মনে ছিল না, মনে পড়িয়াছে,—তাই ভাবনাও হইয়াছে! বিশেষ করিয়া এই যৌবনের উল্লেখটা! লজ্জায় মলিন হাসি হাসিয়া কহিল, 'এখানকার লোকগুলা কি অন্ধ, না

পশু!' কিন্তু মাধবী ভুল করিয়াছিল,—সকলেরই মন তাহার মত একুশ-বাইশ বছরে বৃদ্ধ হইয়া যায় না!

ইহার তিন দিন পরে যখন জমিদারের পিয়াদা তাহার দ্বার-পথে আসন করিয়া বসিল এবং হাঁক-ডাক করিয়া গ্রামবাসীকে জানাইতে লাগিল যে, সুরেন রায় আর একটা নূতন কীর্ত্তি করিয়াছে, তখন মাধবী সন্তোষের হাত ধরিয়া দাসীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া নৌকায় উঠিয়া বসিল।

বাটীর অদূরেই নদী; মাঝিকে কহিয়া দিল, 'সোমরাপুর যাইতে হইবে।' একবার প্রমীলাকে দেখিয়া যাইতে হইবে!

গোলাগাঁ হইতে পনর ক্রোশ দূরে সোমরাপুরে প্রমীলার বিবাহ হইয়াছিল। আজ এক বৎসর হইতে সে শ্বশুর-ঘর করিতেছে। সে হয় ত আবার কলিকাতায় যাইবে,—কিন্তু মাধবী তখন কোথায় থাকিবে? তাই একবার দেখা করা!

সকাল-বেলা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। স্রোতের মুখে নৌকা ভাসিয়া চলিল; বাতাস অনুকূল ছিল না, তাই ধীর-মন্থর-গমনে ক্ষুদ্র নৌকা বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া, শিয়াকুল ও বেতঝোপের কাঁটা বাঁচাইয়া, শরঝাড় ঠেলিয়া ধীরে ধীরে চলিল। সন্তোষকুমারের আনন্দ ধরে না! সে ছইয়ের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া গাছের পাতা ও ডগা ছিঁড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাঝিরা কহিল, "বাতাস না থামিলে কা'ল দুপুর পর্য্যন্ত নৌকা সোমরাপুরে লাগিবে না।"

আজ মাধবীর একাদশী; কিন্তু সন্তোষকুমারের জন্য কোথাও পাল্সি বাঁধিয়া, পাক করিয়া, তাহাকে খাওয়াইতে হইবে। মাঝি

কহিল, "দিস্তেপাড়ার গঞ্জে নৌকা বাঁধিলে বেশ সুবিধা হইবে,—সেখানে সব জিনিষ পাওয়া যায়।"

দাসী কহিল, "তাই কোরো বাপু, যেন দশটা এগারটার মধ্যে ছেলেটা খেতে পায়।"

নবম পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক মাস যায় যায়। একটু শীত পড়িয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের উপরের ঘরে জানালার ভিতর দিয়া প্রাতঃসূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়া বড় মধুর বোধ হইতেছে। জানালার কাছে অনেকগুলি বাঁধা খাতা ও কাগজ-পত্র লইয়া টেবিলের এক পাশে সুরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন; আদায়-উসুল, বাকী-বকেয়া, জমা-খরচ, বন্দোবস্ত, মাম্‌লা-মকদ্দমার নথী-পত্র সব একে একে উল্টাইয়া দেখিতেছিলেন। এ সব দেখা শুনা এক রকম আবশ্যকও হইয়া পড়িয়াছিল, এবং না হইলে সময়ও কাটে না। শান্তির সহিত এ জন্য অনেকখানি ঝগড়া করিতে হইয়াছিল। অনেক করিয়া তবে তাহাকে সে বুঝাইতে পারিয়াছিল যে, অক্ষরের পানে চাহিলেই মানুষের বুকের ব্যথা বাড়িয়া যায় না, কিংবা তৎক্ষণাৎ ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয় না। অগত্যা শান্তি স্বীকার করিয়াছে এবং আবশ্যকমত সাহায্যও করিতেছে।

আজকাল স্বামীর উপর তাহার পূরা অধিকার— তাহার একটি কথাও অমান্য হয় না। কোন দিনই হয় নাই, শুধু পাঁচজন হতভাগা ইয়ার-বন্ধু মিলিয়া দিন-কতক শান্তিকে বড় দুঃখ দিতে-

ছিল। স্ত্রীর আদেশে সুরেন্দ্রর বাহির-বাটীতে পর্য্যন্ত যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে! ডাক্তার মহাশয়ের পরামর্শ ও উপদেশ শান্তি প্রাণপণে খাটাইয়া তুলিবার আয়োজন করিয়াছে।

এইমাত্র সে কাছে বসিয়া রাঙা ফিতা দিয়া কাগজের বাণ্ডিল বাঁধিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ একখানা কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া সহসা ডাকিলেন, "শান্তি!"

শান্তি কোথায় গিয়াছিল—কিছুক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্‌ছিলে?" "হাঁ, আমি একবার কাছারি-ঘরে যাব।"

"না। কি চাই, বল, আমি আনিয়ে দিচ্চি।" "কিছু চাই না, একবার মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌ব।" "তাঁকে ডাকিয়ে পাঠাই,—তোমাকে যেতে হবে না। কিন্তু এমন সময় তাঁকে কেন?" "ব'লে দেব যে, অগ্রহায়ণ মাস থেকে তাঁকে আর কাজ কর্‌তে হবে না।"

শান্তি বিস্মিত হইল; কিন্তু সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তাঁর অপরাধ?"

"অপরাধ যে কি, তা এখন ঠিক বল্‌তে পার্‌চি না,—কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি কর্‌চেন।" তাহার পর আদালতের সার্টিফিকেট্ ও কয়েকখানা কাগজ-পত্র দেখাইয়া কহিলেন, "এই দেখ, গোলাগাঁয়ে একজন বিধবার ঘর-বাড়ী সমস্ত বেনামি নীলামে খরিদ ক'রে নিয়েচে। আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করেনি।"

শান্তি দুঃখিত হইয়া কহিল, "আহা, বিধবা? তবে এ কাজটা ভাল হয়নি—কিন্তু বিক্রী হ'ল কেন?"

"দশ বৎসরের খাজনা বাকি ছিল; সুদে-আসলে দেড় হাজার টাকায় নালিশ হয়েছিল।"

টাকার কথা শুনিয়া শান্তি মথুরানাথের প্রতি একটু নরম হইয়া পড়িল। মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা ম্যানেজার-বাবুর বা দোষ কি? অত টাকা কেমন ক'রে ছেড়ে দেন?"

সুরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিল। শান্তি প্রশ্ন করিল, "অত টাকা ছেড়ে দেবে?"

"দেব না ত কি, অসহায় বিধবাকে বাড়ী ছাড়া কর্‌ব—? তুমি কি পরামর্শ দাও?"

কথাটার ভিতর যতটুকু জ্বালা ছিল, সবটুকু শান্তির গায়ে লাগিল। অপ্রতিভ হইয়া দুঃখিতভাবে সে বলিল, "না, বাড়ী-ছাড়া কর্‌তে বলি না। আর তোমার টাকা তুমি দান কর্‌বে, আমি তাতে বাধা দেব কেন?"

সুরেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "সে কথা নয় শান্তি, আমার টাকা কি তোমার নয়? কিন্তু বল দেখি, আমি যখন না থাক্‌ব, তখন তুমি—" "ও কি কথা—" "তুমি—আমি যা ভালবাসি, তা' কর্‌বে ত?"

শান্তির চোখে জল আসিল, কেন না, স্বামীর শারীরিক অবস্থা ভাল নহে, বলিল, "ও কথা কেন বল?" "বড় ভাল লাগে, তাই বলি। তুমি, আমার কথা, আমার সাধ-ইচ্ছা জেনে রাখ্‌বে না, শান্তি?"

শান্তি চক্ষে অঞ্চল দিয়া মাথা নাড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্র পুনরায় কহিলেন, "আমার বড়দিদির নাম।" শান্তি অঞ্চল সরাইয়া সুরেন্দ্রর মুখপানে চাহিল।

সুরেন্দ্র একখানা কাগজ দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ, আমার

বড়দিদির নাম।" "কোথায় ?" "এই দেখ, মাধবী দেবী—যাঁর বাড়ী নিলাম হয়েচে।"

এক মুহূর্ত্তে শান্তি অনেক কথা বুঝিল। কহিল, "তাই বুঝি সমস্ত ফিরিয়ে দিতে চাইচ ?"

সুরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তাই ব'লে নিশ্চয় ফিরিয়ে দেব—সমস্ত—সব !"

মাধবীর কথায় শান্তি একটু দুঃখিত হইয়া পড়িল; ভিতরে বোধ হয়, একটু হিংসার ভাব ছিল! কহিল, "তিনি হয় ত তোমার বড়দিদি নন্! শুধু মাধবী নাম আছে। নামেতেই এই—" "বড়দিদির নামের একটু সম্মান কর্‌ব না ?" "তা কর, কিন্তু তিনি নিজে কিছু জান্‌তে পার্‌বেন না—" "তা পার্‌বেন না—কিন্তু আমি কি অসম্মান কর্‌তে পারি ?" "নাম ত এমন কত লোকের আছে।" "তুমি দুর্গা নাম লিখে তাতে পা দিতে পার ?" "ছি! ও-কি কথা ? ঠাকুর-দেবতার নাম নিয়ে—"

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, ঠাকুর-দেবতার নাম নাই নিলাম, কিন্তু তোমাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারি, যদি একটি কাজ কর্‌তে পার ?"

শান্তি উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "কি কাজ ?"

দেওয়ালের গায়ে সুরেন্দ্রনাথের একটা ছবি ছিল, সেই দিকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই ছবিটা যদি—" "কি ?" "চারজন ব্রাহ্মণ নিয়ে নদীর তীরে পোড়াতে পার—"

অদূরে বজ্রাঘাত হইলে লোকের যেমন প্রথমে সমস্ত রক্ত নিমেষে সরিয়া যায়, মুখখানা সর্পদষ্ট রোগীর মত নীলবর্ণ হইয়া থাকে,

শাস্তির প্রথমে সেইরূপ অবস্থা হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে মুখে চোখে রক্ত ফিরিয়া আসিল—তাহার পর করুণ-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখ-পানে চাহিয়া সে নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল। পুরোহিত ডাকাইয়া রীতিমত শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া, রাজার অর্দ্ধেক রাজত্ব মানত করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যে, এই বড়দিদি যিনিই হউন, ইঁহার সম্বন্ধে সে আর কোন কথা কহিবে না। তাহার পর ঘরে দ্বার দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সে অশ্রুমোচন করিল। এ জীবনে এমন কটু কথা সে আর কখনও শোনে নাই!

সুরেন্দ্রনাথও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেলেন! কাছারি-ঘরে মথুরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোলাগাঁয়ে কার সম্পত্তি নিলাম হয়েচে?" "মৃত রামতনু সান্যালের বিধবা পুত্রবধূর—" "কেন?" "দশ বছরের মাল-গুজারি বাকি ছিল—" "কই খাতা দেখি—"

মথুরানাথ প্রথমে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল; তাহার পর কহিল, "খাতা-পত্র এখনও পাবনা থেকে আনা হয় নি।"

"আনাতে লোক পাঠাও। বিধবার থাক্‌বার স্থানটুকু পর্য্যন্ত রাখো নি?" "বোধ হয় নেই।" "তবে সে কোথায় থাক্‌বে?"

মথুরানাথ সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, "এতদিন যেখানে ছিল, সেখানে থাক্‌বে, বোধ হয়।" "এতদিন কোথায় ছিল?" "কল্‌-কাতায়। তাহার পিতার বাটীতে।" "পিতার নাম কি জান?" "জানি। ব্রজরাজ লাহিড়ী।" "বিধবার নাম?" "মাধবী দেবী।"

নতমুখে সুরেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া পড়িলেন। মথুরানাথ

ভাব-গতিক দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল ?" সুরেন্দ্রনাথ সে কথার উত্তর না দিয়া, একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন,"একটা ভাল ঘোড়ায় শীঘ্র জিন কষিতে বল—আমি এখনি গোলাগাঁয় যাব। এখান থেকে গোলাগাঁ কতদূর জান ?"

"প্রায় দশ ক্রোশ।" "এখন নয়টা বেজেচে—একটার মধ্যে পৌছিতে পার্‌ব।"

ঘোড়া আসিলে তাহাতে চড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "কোন্ দিকে ?" "উত্তর দিকে, পরে পশ্চিমে যেতে হবে!"

তাহার পর চাবুক খাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ কথা শুনিয়া শান্তি ঠাকুর-ঘরে মাথা খুঁড়িয়া রক্ত বাহির করিল, "ঠাকুর, এই তোমার মনে ছিল! আর কি ফিরে পাব ?"

তাহার পর দুইজন পাইক ঘোড়ায় চড়িয়া গোলাগাঁ উদ্দেশে ছুটিয়া গেল ? জানালা দিয়া তাহা দেখিয়া শান্তি ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল। মা দুর্গা! জোড়া মোষ দেব—যা' চাও, তাই দেব—তাঁকে ফিরিয়ে দাও—বুক চিরে রক্ত দেব—যত চাও—হে মা দুর্গা, যত চাও—যতক্ষণে না তোমার পিপাসা মিটে!

গোলাগাঁ পৌঁছিতে আর দুই ক্রোশ আছে। অশ্বের ক্ষুর পর্য্যন্ত ফেনায় ভরিয়া গিয়াছে! প্রাণপণে ধূলা উড়াইয়া, আল ডিঙাইয়া, খানা টপ্‌কাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া চলিয়াছে! মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য!

ঘোড়ার উপর থাকিয়াই সুরেন্দ্রর গা বমি-বমি করিয়া উঠিল; ভিতরের প্রত্যেক নাড়ী যেন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবে! তাহার পর টপ্ করিয়া ফোঁটা দুই-তিন রক্ত কষ বহিয়া ধূলিধূসরিত

পিরাণের উপর পড়িল; সুরেন্দ্রনাথ হাত দিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিলেন। একটার পূর্ব্বেই গোলাগাঁয়ে উপস্থিত হইলেন! পথের ধারে দোকানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গোলাগাঁ?" "হাঁ!" "রামতনু সান্ন্যালের বাটী কোথায়?"—"ঐ দিকে—"

আবার ঘোড়া ছুটিল। অল্পক্ষণে বাঞ্ছিত বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারেই একজন সিপাহী বসিয়াছিল; প্রভুকে দেখিয়া সে প্রণাম করিল।

"বাটীতে কে আছেন?" "কেউ না।" "কেউ না? কোথায় গেলেন?" "ভোরেই নৌকা ক'রে চলে গেচেন।" "কোথায়—কোন্ পথে?" "দক্ষিণ দিকে—" "নদীর ধারে-ধারে পথ আছে? ঘোড়া দৌড়তে পারবে?" "বল্‌তে পারি নি। বোধ হয়, নেই।"

পুনর্ব্বার ঘোড়া ছুটিয়া চলিল। ক্রোশ দুই আসিয়া আর পথ নাই। ঘোড়া চলে না। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া তখন সুরেন্দ্রনাথ পদব্রজে চলিলেন। একবার চাহিয়া দেখিলেন—জামার উপর অনেক ফোঁটা রক্ত ধূলায় জমিয়া গিয়াছে। ওষ্ঠ বাহিয়া তখনও রক্ত পড়িতেছে। নদীতে নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলেন—তার পর প্রাণপণে ছুটিয়া চলিলেন। পায়ে আর জুতা নাই—সর্ব্বাঙ্গে কাদা, মাঝে মাঝে শোণিতের দাগ! বুকের উপর কে যেন রক্ত ছিটাইয়া দিয়াছে।

বেলা পড়িয়া আসিল। পা আর চলে না—যেন এইবার শুইতে পারিলেই জন্মের মত ঘুমাইয়া পড়িবে—তাই যেন অন্তিম-শয্যায় এই জীবনের মহা-বিশ্রামের আশায় সে উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছে।

এ দেহে যতটুকু শক্তি আছে, সমস্ত অকাতরে ব্যয় করিয়া শেষে শয্যা আশ্রয় করিবে, আর উঠিবে না !

নদীর বাঁকের পাশে—একখানা নৌকা না ? কল্‌মী শাকের দল কাটিয়া পথ করিতেছে ! সুরেন্দ্র ডাকিল, "বড়দিদি !" শুষ্ক-কণ্ঠে শব্দ বাহির হইল না—শুধু দুই ফোঁটা রক্ত বাহির হইল।

"বড়দিদি"—আবার দুই ফোঁটা রক্ত।

কল্‌মীর দল নৌকার গতি রোধ করিতেছে। সুরেন্দ্র কাছে আসিয়া পড়িল !

আবার ডাকিল, "বড়দিদি।"

সমস্ত দিনের উপবাস ও মনঃকষ্টে মাধবী নির্জ্জীবের মত নিদ্রিত সন্তোষকুমারের পার্শ্বে চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল। সহসা কাণে শব্দ পৌঁছিল ; পুরাতন পরিচিত স্বরে কে ডাকে, না ! মাধবী উঠিয়া বসিল। ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল। সর্ব্বাঙ্গে ধূলা-কাদা মাখা—মাষ্টারমহাশয় না ?

"ও নয়নতারার মা, মাঝিকে শীগ্‌গীর নৌকা লাগাতে বল্।"

সুরেন্দ্রনাথ তখন ধীরে ধীরে তাহার উপর শুইয়া পড়িতেছিল। সকলে মিলিয়া সুরেন্দ্রনাথকে ধরাধরি করিয়া নৌকায় তুলিয়া আনিল ; মুখে-চোখে জল দিল। একজন মাঝি চিনিত, সে কহিল, "লাল্‌তা গাঁয়ের জমিদার।" মাধবী ইষ্ট-কবচ শুদ্ধ স্বর্ণাহার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া লইয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "লাল্‌তাগাঁয়ে এই রাত্রে পৌঁছিতে পার ? সবাইকে এক একটা হার দেব।"

সোনার হার দেখিয়া তাহাদের মধ্যে তিনজন গুণ ঘাড়ে লইয়া নামিয়া পড়িল।

"মা ঠাক্‌রুণ, চাঁদনি রাত ; ভোর নাগাদ পৌঁছে দেব।"

সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান হইল। চক্ষু মেলিয়া সে মাধবীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই, শুধু কপালের কিয়দংশ অঞ্চলে ঢাকা। ক্রোড়ের উপর সুরেন্দ্রের মাথা লইয়া মাধবী বসিয়াছিল।

কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া সুরেন্দ্র কহিল, "তুমি বড়দিদি ?"

অঞ্চল দিয়া মাধবী সযত্নে তাহার ওষ্ঠ-সংলগ্ন রক্তবিন্দু মুছাইয়া দিল, তাহার পর আপনার চোখ মুছিল।

"তুমি বড়দিদি ?" "আমি মাধবী।"

সুরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুদিয়া মৃদু মৃদু স্বরে বলিল, "আঃ, তাই !"

বিশ্বের আরাম যেন এই ক্রোড়ে লুকাইয়া ছিল। এতদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছে ! অধরের কোণে সরক্ত হাসিও তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। "বড়দিদি, যে কষ্ট।"

তর্ তর্ ছল্ ছল্ করিয়া নৌকা ছুটিয়াছে। ছইয়ের ভিতর সুরেন্দ্রর মুখের উপর চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে। নয়নতারার মা একটা ভাঙ্গা পাখা লইয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কহিল, "কোথায় যাচ্ছিলে ?"

মাধবী ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "প্রমীলার শ্বশুরবাড়ী !"

"ছিঃ, এমন করে কি কুটুমের বাড়ী যেতে আছে, দিদি ?"

দশম পরিচ্ছেদ

নিজের অট্টালিকায়, তাহার শয়ন-কক্ষে, বড়দিদির কোলে মাথা রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথ মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া আছে। পা-দুটী শান্তি কোলে করিয়া অশ্রুজলে ধুইয়া দিতেছে। পাবনার যতগুলি ডাক্তার কবিরাজ সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রমে রক্ত বন্ধ করিতে পারিতেছে না, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই আঘাতে এমন রক্ত বমন করিতেছে।

মাধবীর অন্তরের কথা খুলিয়া বলিতে পারিব না। আমি নিজেও ভাল জানি না, বোধ করি তাহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়িতেছে। বাড়ী হইতে সে তাড়াইয়া দিয়াছিল, আর ফিরাইতে পারে নাই; পাঁচ বৎসরের পরে সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাকে ফিরাইতে আসিয়াছে।

সন্ধ্যার পর উজ্জ্বল দীপালোকে সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর মুখ পানে চাহিল। পায়ের কাছে শান্তি বসিয়া আছে, সে যেন শুনিতে না পায়, হাত দিয়া তাই মাধবীর মুখ আপনার মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "বড়দিদি, সে দিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে? আমি তাই এখন শোধ নিয়েচি, তোমাকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কেমন শোধ হ'ল ত?" মুহূর্ত্তের মধ্যে মাধবী চৈতন্য হারাইয়া লুণ্ঠিত-মস্তক সুরেন্দ্রের স্কন্ধে পার্শ্বে রাখিল,—যখন জ্ঞান হইল, তখন বাটীময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

গ্রন্থাবলী